দিক মোটা কাপড় কোনও আপত্তি নেই। তেমনি আল্লাহতালাও চান বান্দার অন্তর জুড়ে সব সময় আমার ভালবাসা, আমার স্মরণ বিরাজমান থাকুক।

আর যদি স্বামী অন্যের হয়ে যায় তারপর যতই সোনা দানা আর ধন সম্পদ স্ত্রীর পায়ের তলায় ফেলে দেয় তাতে স্ত্রী সুখী হয় না। তেমনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও বান্দার অন্তরে দৃষ্টি রাখেন। দেখেন সেখানে তিনি আছেন না অন্য কোনও সৃষ্ট বস্তুর ভালবাসা রয়েছে আমরা কি জানি কেন ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এর কাছ থেকে তার নয়নের মনি, আদরের দুলাল নবী সন্তান ইউসুফ আলাইহিস সালাম কে কেড়ে নিয়েছিলেন? বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন? চল্লিশ বছর ধরে পিতা পুত্র আলাদা ছিলেন।

কেন?

মিশর থেকে শ্যামদেশ (বর্তমান সিরিয়া) মাত্র এক মাসের পথ অথচ কেউ কারো দেখা পাচ্ছে না। জানতে পারছে না কে কোথায়, কতদূর, কেমন আছে? ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর অনুমতি নেই যে পিতাকে জানায়; আমি কাছেই আছি। পাশেই আছি ভাল আছি। কেঁদো না।

ওদিকে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এর চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছে।

'আব্ ইয়াদ্দাতা আয়না মিনাল্ হুজ্নি ফাহুয়া কাবিম–'

তারপর যখন দেখা হলো ইয়াকুব আলাইহিস সালাম আবার চক্ষুষ্মান হলেন। বাপ বেটার মিলন হলো।

তখন আল্লাহতায়ালা ইয়াকুব আলাইহিস সালাম কে বললেন, 'তুমি কি জানো, কেন তোমাকে তোমার সন্তান থেকে আলাদা করে দিয়েছিলাম ? কারণ, একদিন তুমি নামাজ পড়ছিলে। পড়তে পড়তে আচমকাই তোমার কানে ভেসে এলো ইউসুফের কান্নার শব্দ।

তোমার দৃষ্টি পিছলে চলে গেল ইউসুফ আলাইহিস সালামের দিকে। আমি তীব্র অভিমানে সিদ্ধান্ত নিলাম বিচ্ছিন্ন করবো তোমাকে। ইউসুফের কাছ থেকে। আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমারই সৃষ্ট ইউসুফের দিকে আমার নবীর দৃষ্টি! নবী হয়ে স্রষ্টাকে অবহেলা করে সৃষ্টির দিকে নজর। আল্লাহ তার সাথে কারও অংশীদারী পছন্দ করেন না। আল্লাহ তায়ালা মহান বিশ্বপ্রভু তার ভালবাসার কারও অংশী পছন্দ করেন না। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এর মতো খলিল যখন তার নবী পুত্র ঈসমাইল এর দিকে বার বার মমতার দৃষ্টি ফেলছেন জবাই এর পূর্ব মুহূর্তে (আর এটা স্বাভাবিক পিতা তার পুত্রকে এমন সঙ্গীণ মুহূর্তে দেখবেই। তা জেনে হোক বা অজান্তেই ।)

তো ঠিক তখনি অদৃশ্য থেকে রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করলেন, 'ইব্রাহিম ----ছুরি চালাও----ছুরি চালাও --!!'

সত্তুর বার ছুরি চালালেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম।

প্রথম বারেই দুম্বা রাখতে পারতেন আল্লাহ তালা। কিন্তু বার বার তাকে দিয়ে ছুরি চালালেন। ছুরি চালাতে চালাতে অন্তর থেকে তার সব অপত্য স্নেহের উদ্দীপনা নিঙড়ে বের করে নিলেন। প্রতিবার ছুরি চালাচ্ছেন! ছেলের গলায়! আপন ছেলে! নবী! বুক ভরা ভালবাসা তিল তিল করে বলি দিচ্ছেন। উজাড় করা পুত্র প্রেম মুখ থুবড়ে পড়ছে। আসমান জমিন নিথর। রুদ্ধশ্বাস। আসমানের বাসিন্দাদের মাঝে কান্নার রোল!

সত্তুর বার! পুত্রের জন্য আর কিছুই রইলো না! নবী ইব্রাহিম এর মনের কোণে! বাকী থাকলো আল্লাহকে রাজী খুশি করার নিশ্ছিদ্র আর নির্ভেজাল উদ্দীপনা! উদ্যম! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের কাছে এটাই আল্লাহর চাওয়া। সব কিছু ছেড়ে আমার সাথে সম্পর্ক করো। প্রেমের,

ভালবাসার আর আনুগত্যের মহান সম্পর্ক। আমার জন্যে আত্ম বলিদান দাও। আমি ছাড়া সবকিছুকে বের করে দাও অন্তর থেকে। আমি আল্লাহ তোমাদের জন্যে সবচেয়ে উত্তম।

এজন্যে বান্দা যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন মগ্ন হয় আল্লাহর প্রতি। পূর্ণ মনোযোগ দেয় সর্বশক্তিমানের দিকে। তারপর কখন জানি আচমকাই কীসের চিন্তা কীসের ভাবনা তাকে উদাসীন করে দেয়। অন্যমণস্ক হয় আল্লাহর থেকে। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আসমান থেকে আওয়াজ দেন, 'ইয়া ইবনি আদাম! ইলা মান্ তাল্তাফিৎ। ইলা মান হুয়া খায়রুম্ মিন্নী?'

হে বনী আদম তুমি আমার দিক থেকে মুখ ফেরালে কেন? তুমি কি আমার চেয়ে উত্তম কিছু পেয়েছ? আমার চেয়ে বেশি কী সৌন্দর্য তুমি পেলে? তুমি কাকে দেখছো? কার ভাবনা পেয়ে বসলো তোমাকে? যে তুমি আমার মতো দয়ালু কে ভুলে গেলে? বান্দা বিশ্বাস করো, আমার চেয়ে বেশি সুন্দর, বেশি উত্তম আর কিছু নেই। তুমি কার দিকে মুখ ফেরালে? বান্দা, তুমি আমাকে ছেড়ে কাকে দেখছো? আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!

বলুন, স্বয়ং আল্লাহ, স্রষ্ট নিজে তার বান্দার সাথে এমন অনুরোধ উপরোধ! আমাদের কাছে তার কী ঠেকা? কী প্রয়োজন আমাদের তার কাছে। কী মূল্য আছে তার কাছে আমাদের?

তবু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বান্দাকে ডাকতে থাকেন। আল্লাহু আকবার! আশ্চর্য! তিনি মালিক হয়ে বান্দাকে ডাকতে থাকেন। সেই আল্লাহ! যাঁর এতো বড় মাহাত্ম ও পরাক্রম যে তিনি যখন জিব্রাইল আমিনের মতো এতো বড় ফিরিস্তা (যার মাথা সিদরাতুল মুনতাহা আর পা তাহতাস সারা আর দেহ গোটা দুনিয়া জুড়ে বিস্তৃত) কে ডাকেন, 'হে জিব্রাইল!' সাথে সাথে আসমানের উপর থেকে সাত জমিনের নিচ পর্যন্ত দীর্ঘ ও ছয়শত পাখা বিশিষ্ট সুবিশাল জিব্রাইল আলাইহিস সালাম; যার পায়ের আঙুল থেকে মাথার চুল পর্যন্ত পৌঁছাতে সাড়ে চোদ্দ হাজার বছরের পথ পেরুতে হয় তিনি ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে একটা পাখির মতো কাঁপতে থাকেন। যার সামনে আসমান ঝুঁকে আছে, তারা মন্ডলী ঝুঁকে আছে। পাথর রয়েছে সিজদায়। পাহাড়গুলো তার সামনে ঝুঁকে রয়েছে সিজদায় রত আছে সমুদ্র সাগর, নদ নদী, খাল বিল, মহাসমুদ্র, গাছ পালা। এক একটা পাতা সিজদা করছে। যিনি রাহীম, ওয়াহহাব, রাজ্জাক, মালিকাল মুল্ক, রাহিমাল মাসাকীন, জুল জালালি অল ইকরাম,আর হামার রাহিমীন, মাতিন, আওয়ালুল আওয়ালিন, আখিরাল আখিরিন, আত তাওয়াব, জুল কুয়াতিল মাতিন, আল বার, ওয়াকিল, ওয়ালি–এত বড় গুণাবলীর আল্লাহ তায়ালা। যিনি কোন কিছুর সাহায্য ছাড়া গোটা বিশ্বজগৎকে একা একাই সৃষ্টি করেছেন। এমন পবিত্র মহামহিমান্বিত আল্লাহ তায়ালা পায়খানা পেশাব আর নাপাকি ভরা মানুষকে ডাকতে থাকেন।

'আরে বান্দা আমি তোর দিকে চেয়ে আছি আর তুই কার দিকে?'

'মানজা তুহা মাশহুম তুবা , আমারি গারিব!

'আরে! আমি তোর দিকে চেয়ে রয়েছি, তুই কাকে দেখছিস?'

তারপরও যদি বান্দা তার দিকে ফিরে না তাকায় তখন আল্লাহতায়ালা ডেকে বলেন আমার বান্দা তুই কাকে দেখছিস? আমার সৃষ্টিকে? না–না তুই আমার দিকে দেখ!

এবারও যদি বান্দা তার দিকে রুজু না হয় তখন আল্লাহ তায়ালা আবার বলেন, 'ও আমার বান্দা তুই কাকে দেখছিস? আমার সৃষ্টি। না–না তুই আমার দিকে ফিরে দেখ।

এখনও যদি বান্দা আল্লাহ রাব্বুল আলআমীনের দিকে মনোনিবেশ না করে তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, 'কী আশ্চর্য! আমার এই বান্দার দেখছি আমাকে কোন প্রয়োজন নেই!!

তো ভাই, এমন আল্লাহকে নিজেকে নিঃশেষ করে পেতে হবে। এমন আল্লাহ্‌র জন্যে বরণ করে নিতে হবে মৃত্যু কে।

এমন কারিম, রাহিম, শফিক, হান্নান, মান্নান, রাহমান, দাইয়ান আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক না করা; আর টাকা, পয়সা, ধন দৌলতের সাথে সম্পর্ক করা বা মন লাগানো কতবড় অন্যায়, কত বড় জুলুম! নবী ও পয়গম্বরগণ বান্দাদের এমন অন্যায় থেকে বের করে আনতেন। নবীরা কী করতেন?

এমন জুলুম বা অবিচার থেকে আল্লাহ্‌র বান্দাদের উদ্ধার করতেন। তারা বলতেন, ভাই, তুমি মালিককে চিনে নাও। তোমার স্রষ্টাকে চিনে নাও। ভাই, তাঁর সাথে সম্পর্ক করো যিনি তোমাকে পয়দা করেছেন। আল্লাহ্‌পাক নিজে বলেন–

'ইয়া আইয়্যুহাল ইনসান্ মা গাররাকা বিরাব্বিকাল কারীম!'

'হে পথভোলা মানুষ! কী জিনিস তোমাকে দয়ালু প্রভুর ব্যাপারে ধোঁকা দিয়ে দিল! কেন ভুলে গেলি দয়ালু প্রভুকে।'

আল্লাহ্‌পাকের তো অনেক বড় বড় গুণবাচক নাম আছে; কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা যখন কুরআনকে শুরু করলেন তো সবার পয়লা নিজের রবুবিয়াতের সাথে বান্দার পরিচয় করিয়েছেন।

'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন–

'সব প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার–'

আল্লাহ্ কে ? তিনি, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক, রব! রাব্বিল আলামীন!

আল্লাহু আকবার! তিনি কিভাবে প্রতিপালন করেন? আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন–

'শাররুহুম ইলাইয়া শায়িজ অ খায়রি ইলাইহিম নাজিল আক্‌লাওহুম ফি মাদাজিইল কাআন্নাহুম ইয়াম্‌ইয়াম আকুনি–'

'আমি তোমাদেরকে এমনভাবে প্রতিপালন করি যে, প্রতিদিন তোমার গোনাহ্ আমার কাছে আসে তবু আমার রহমতের দরোজা আমি খুলে দিই। আর আমি রাতের বেলা তোমাকে এমনভাবে ঘুম পাড়িয়ে দিই যে, যেন তুমি আমার কোন অবাধ্যতাই করোনি!'

নবী কী করেন? নবী আমাদের বলেন, আল্লাহ্‌র থেকে সবকিছু হয়। আল্লাহ্‌ই বাঁচান ও মারেন। তিনি ইজ্জত দেন, তিনিই অপমান করেন। কাজেই আল্লাহ্‌র দিকে এগিয়ে যাও। দৌড়ে চলো। তাঁর জন্যে মৃত্যুকে বরণ ও আপন করে নাও।

আল্লাহ্ কি রকম রাহমান, রাহীম, কারিম বা দয়ালু?

'ইন্ তাকার্‌রাব ইলাইয়া শিবরা–'

'তুমি এক বিঘত আমার দিঁকে এসো–'

'তাকার্‌রাবতু ইলাইহি জিরাআ–'

'আমি এক হাত এগিয়ে যাবো তোমার দিকে–'

'ইন তাকার্‌রাব্ ইলাইআ জিরাআ–'

'তুমি এক হাত এগিয়ে এসো–'

'তাকার্‌রাব্‌তা মিনহু বায়া–'

'আমি দু'হাত এগিয়ে যাবো–'

'ইন্ আতানি ইয়াম্‌শি–'

'তুমি চলতে থাকবে–'

'আতায়তুহু হারওয়ানা–'

'আমি তোমার দিকে দৌড়ে আসবো।'

তার মানে আল্লাহ্‌র রহমত বা দয়া দৌড়ে আসবে।

কত বড় কারিম, রাহমান, রাহিম, দয়ালু আল্লাহ্‌তায়ালা। বান্দা সামান্য উদ্যোগ নিবে তিনি দৌড়ে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে নেবেন। সুব্‌হানাল্লাহ।

তো ওই আল্লাহ্‌তায়ালাকে মন দেয়া এবং সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর প্রভাব দিল থেকে বের করা হচ্ছে সফলতার প্রথম সিঁড়ি।

আমি ওই আল্লাহ্‌তায়ালাকে মানবো। যিনি ছাড়া কেউ কিছু করতে পারে না, তিনি সবকিছু ছাড়া যাবতীয় কাজ সম্পাদন করেন। আমি বিশ্বাস আনবো আল্লার প্রতি তাঁর সমস্ত ক্ষমতা ও গুণাবলী সহকারে। তাঁর গুণবাচক নাম কি? রাহমান, রাহিম, কারীম, জাব্বার, হান্নান, মান্নান। তিনি দয়ালু, পরম করুণাময়। তিনি আমাকে ভালবাসেন মা'র চেয়ে। মা'য়ের ভালবাসার চেয়ে সত্তুরগুণ বেশি ভালবাসেন।

যে মায়ের একটা মাত্র ছেলে। চোখের তারা সে মায়ের। অন্তরের একমাত্র শান্তির কারণ সে। কলিজার টুকরা। কিন্তু ওই মাকেই ছেলে যখন একবার ডাকে 'মা–'। মা জবাব দেন 'জ্বি'। আবার ছেলে ডাকে 'মা'। 'জ্বি' – জবাব দেন মা।

ছেলে আবার ডাকে। মা জবাব দেন। আবার ডাকে ছেলে। মা জবাব দেন। ছেলে বার বার ডাকে। হঠাৎ বিরক্ত হয়ে যান মা। বলেন, 'মা' 'মা' ডেকে মাথা খাবি নাকি? চুপ কর্!

অথচ বান্দা যখন তার প্রভুকে ডাকে 'আল্লাহ্!'

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সত্তর বার তার জবাব দেন। সুব্‌হানাল্লাহ!

আবার ডাকে 'ইয়া আল্লাহ্!'

'লাব্বাইক ইয়া আবদি!'

'আমি হাজির আছি হে আমার বান্দা!' জবাব দেন আল্লাহ্। সত্তুর বার! আল্লাহু আকবার।

এই ভাবে বান্দা হাজার বার ডাকে। 'ইয়া আল্লাহ্।' সত্তুর হাজার বার জবাব দেন আল্লাহ্।

'লাব্বাইক' 'লাব্বাইক'---!

একটা ঘটনা আছে।

এক মূর্তিপূজক ছিল। সে আল্লাহ্‌তায়ালা সম্পর্কে কিছুই জানতো না। আমরা তো মুসলমান হিসাবে আল্লাহ্‌তালার জাত ও সীফাতকে জানি। তো সেই পূজারী পূজার ঘরে ঢুকে মূর্তিকে ডাকতো 'সানাম' 'সানাম'---।

সত্তর বছর ধরে সে ডাকলো। একদিন হঠাৎ। ফসকে ভুল একটা শব্দ বেরুলো তার মুখ থেকে। 'সামাদ'।

আসমান থেকে সাথে সাথে প্রতি উত্তর ভেসে এলো 'লাব্বাইক ইয়া আবদি!'

ফিরিশতারা আরজ করলো, 'হে আল্লাহ্! এই পূজারী তো আপনার সম্পর্কে জানেই না।'

'কিন্তু সে আমাকে ডেকেছে।' বজ্রনির্ঘোষে আল্লাহ্ বললেন।

'ভুল করে ডেকেছে, হে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন! তবু আপনি জবাব দিলেন?!'

'আরে ফিরিশতারা! আমি সত্তর বছর ধরে অপেক্ষা করছি কখন আমার এই বান্দা আমার নাম উচ্চারণ করবে। একবার মাত্র। আর সাথে সাথেই 'আমি হাজির বান্দা' বলবো। যদিও সে ভুল করে আমাকে ডাকে।'

হায় দুর্ভাগা মানুষ!

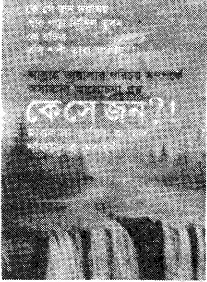
তুই চিনলি না তোর দয়াল মালিককে!

মালিক রাহমান, মালিক রাহীম, মালিক কারীম।

তিনি চান তাঁর বান্দার অন্তর আর কারো দিকে না পড়ুক। আর কারও দিকে না ঝুঁকে যায়। আমার এতো আদরের বান্দা সে যেন আমারই সৃষ্ট অন্য কোনও জিনিসকে মন না দিয়ে বসে।

আর আমরা।

আমরা আজ কোথায়?!



চার

এভাবে আল্লাহতালার প্রতিটি সীফাত বা গুণের সাথে পরিচিত হওয়া।

'আমানতু বিল্লাহি কামা হুয়া বিআসমাইহি অ-সীফাতিহি'।

'আমি ঈমান আনলাম আল্লাহতালার প্রতি ও তাঁর গুণাবলীর ওপর'।

আমাদের চিন্তা করতে হবে তাঁর নাম ও গুণাবলীর ওপর। রাসুলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,'তাফাক্কুরু শাআতিন খায়রুম মিন ইবাদাতি শানাতিন' 'এক ঘন্টার ধ্যান (আল্লাহর মহিমা সম্পর্কিত) ও চিন্তা এক বছরের ইবাদাতের চেয়ে উত্তম।'

কালামে পাকেও আল্লাহতালা অনেক জায়গায় তাফাক্কুর (ধ্যান-চিন্তা), তাদাব্বুর (অনুধাবন-উপলদ্ধি), নাজার (পর্যবেক্ষণ) ও ই'তেবার (অনুধাবন) এর মাঝ দিয়ে উপদেশ নিতে হুকুম করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একবার ক'জন সাহাবা (রাঃ) কোনও জায়গায় বসে আল্লাহতালার সত্ত্বা ও অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা করছিলেন। এমন সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে এলেন। তিনি সাহাবা (রাঃ)দের চিন্তা-ভাবনার বিষয় বস্তু সম্পর্কে জানতে পারলেন। বললেন, 'তোমরা আল্লাহ তালার সৃষ্টি-নৈপুণ্য নিয়ে চিন্তা আর গবেষণা করো, তাঁর অস্তিত্ব নিয়ে ভেবো না। কারণ,তাঁর বিষয়ে চিন্তা করলে কোনও সার উদ্ধার করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। তাছাড়া তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে উপলদ্ধি করতে তোমরা সক্ষম হবে না। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেছেন, 'একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গভীর রাতে নিরিবিলি নামাযে মগ্ন থেকে কান্নাকাটি করছিলেন। আমি আরজ করলাম,"ইয়া রাসুলাল্লাহ! আল্লাহতালা তো আপনার সব রকম গোনাহই মাফ করে দিয়েছেন; তারপরও আপনি কেন এমন কাতর হয়ে কান্নাকাটি করছেন?" হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "দেখ আয়েশা, না কেঁদে আমি কেমন করে থাকতে পারি? যখন তিনি আমার ওপর এই আয়াত অবতীর্ণ করেছেন-

'ইন্না ফি খালকিস্ সামাওয়াতি অল্ আরদি অখতিলাফিল লাইলি অন্ নাহার লি আয়াতিল লি উলিল আল্বাব্।' 'নিশ্চয়ই, আসমানগুলো আর জমিনের সৃষ্টির মাঝে আর দিন-রাত্রির পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল লোকের জন্যে অনেক নিদর্শন জড়িয়ে রয়েছে।'

তারপর তিনি (সাঃ) আরও বললেন , 'যে মানুষ এই আয়াত পড়ে বর্ণিত জিনিস গুলোর ওপর চিন্তা ভাবনা না করে তার জন্যে দুঃখ।'

হযরত ঈসা আলাইহিস্সালামকে লোক জিজ্ঞেস করেছিল,' হে রুহুল্লাহ! এই ভূপৃষ্ঠে ... আর কেউ আছে কি?'

'আছে,' উত্তরে তিনি বললেন,'সে, যার মুখের কথা শুধু আল্লাহতালার স্মরণের জন্যে উচ্চারিত হয়। আর তার চুপ থাকা কেবল আল্লাহ তালার মহিমা ভাবার জন্যে হয়। আর তার দেখা শুধু দৃষ্ট জিনিস থেকে উপদেশ নেয়ার জন্যে হয়ে থাকে। সে জন আমার বরাবর।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা ইবাদাতে নিজেদের চোখকে শরীক করাও।'

সাহাবা (রাঃ) গণ জিজ্ঞেস করলেন,'হে আল্লাহর রাসুল! চোখকে আবার কেমন করে ইবাদাতে শরীক করবো?' তিনি (সাঃ) বললেন,'কোরআন শরীফ চোখের সামনে রেখে দেখে দেখে তিলাওয়াত করো। আল্লাহ তা'লার বাণীগুলোর অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করো আর যে সব বিচিত্র ভাষা ও ঘটনার কথা রয়েছে তা থেকে উপদেশ নাও।'

হযরত দাউদ তাঈ (কুদ্দিসা সিররুহু) একদিন রাতে নিজ ঘরের ছাদে উঠে আকাশলোকের বিচিত্র কারুকার্য ও সৃষ্টি-নৈপুণ্য সম্পর্কে ধ্যান মগ্ন হয়ে ব্যাকুল চিত্তে কান্নাকাটি করছিলেন । কাঁদতে কাঁদতে এক সময় জ্ঞান হারিয়ে প্রতিবেশীর বাড়ির মধ্যে পড়ে গেলেন। পতনের শব্দে প্রতিবেশীর ঘুম ভেঙে গেল। তারা ভাবলো চোর পড়েছে। গৃহস্বামী তাড়াতাড়ি তলোয়ার হাতে সেখানে এসে পড়লেন। দাউদ তাঈ (রঃ) কে দেখে তিনি অবাক। সসম্ভ্রমে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে আপনাকে এখানে ফেলে দিল?'

তিনি শুধু বললেন,' জানি না।'

জগতের প্রভু আল্লাহতা'লা মানুষকে অজ্ঞানতা ও মূর্খতার অন্ধকারে ঢেকে সৃষ্টি করেছেন। হাদীস শরীফে আছে,' খুলিকাল খাল্কু ফি জুলমাতিন সুম্মা রুস্সা আলাইহিম মিন্ নুরীহি।'অর্থাৎ মানুষ অজ্ঞানতা ও মূর্খতার আঁধারের মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে। তারপর তাদের ওপর আল্লাহতালা আলো বর্ষণ করেছেন। পথিক যেমন অন্ধকারে পড়ে গেলে আলো জ্বেলে পথ দেখে নেয় তেমনি অন্ধ মানুষের মাঝে আলো জ্বলে ওঠে যখন সে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সত্ত্বা ও গুণাবলী সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা, আলোচনা করে ও শোনে।

আল্লাহর জাত ও সীফাত সম্পর্কে আলোচনা বলা ও শোনার দ্বারা তিন ধরনের ফল পাওয়া যায়।

(১) মারেফাৎ বা তত্ত্বজ্ঞান, (২) হালাত বা মনের পরিবর্তন, (৩) আমল বা কর্ম ।

তত্ত্বজ্ঞানের আলোতে মনের পরিবর্তন হয়। তখন সে উদ্দীপ্ত হয় নেক কর্মপ্রচেষ্টায়।

আল্লাহ্তালা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি তত উঁচু পর্যায়ে পৌঁছুতে পারে না। মানুষ আল্লাহ্তালার অস্তিত্ব ও সত্ত্বা সম্পর্কে চিন্তা করার কোনও পথই খুঁজে পায় না। এই জন্যেই আল্লাহ্তালা বলেন-

'ফাইন্নাকুম লান তাক্বদীরু ক্বাদরাহু।'

'নিশ্চয় তোমরা কখনও আল্লাহ্তালার অপার মহিমা উপলব্ধি করতে পারবে না।'

আল্লাহ্তালার প্রতাপ ও মহত্বের জ্যোতি সীমাহীনভাবে উজ্জ্বল ও প্রখর। এদিকে মানুষের জ্ঞান-চক্ষুর ধ্যান-চিন্তার ক্ষমতা খুবই দুর্বল। কাজেই সেই তীব্র উজ্জ্বলতা ও প্রখর দীপ্ত মহিমা ও প্রতাপ সম্পর্কে চিন্তার ক্ষমতা মানুষের নাই। বরং তাতে জ্ঞান-চক্ষু ঝলসে যায়। অন্ধ হয়ে যায়।

সেজন্য আমাদের আলোচনা আল্লাহ্তালার বিচিত্র সৃষ্টি নৈপূণ্য ও বিস্ময়কর শিল্প চাতুর্য নিয়ে। এর থেকে আমরা তাঁর বড়ত্ব, মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করতে পারবো। বিশ্বজগতে যত বিস্ময়কর ও বিচিত্র সৃষ্ট পদার্থ রয়েছে সবই তাঁর সীমাহীন ক্ষমতা ও অপার শ্রেষ্ঠত্বের আলোকমালা থেকে ছিটকে পড়া একটা কণার মতো। সেজন্যেই আল্লাহ্তায়ালা বলেন, 'কোল্ লাও কানাল বাহ্রো মিদাদাল্ লিকালিমাতু রাব্বি লানা ফিদাল্ বাহ্রু কাব্লা আন্ তান্ফাদা কালিমাতু রাব্বি; অলাও জিনা বিমিস্লিহি মাদাদা।'

'হে মুহাম্মদ! (সাঃ) আপনি মানুষকে বলে দিন, যদি সব সমুদ্রের পানি লেখার কালি হয় আমার প্রভুর বিচিত্র সৃষ্টি-নৈপূণ্য ও অপার মহিমা লিখে শেষ করার জন্যে, তাহলে সমস্ত

সমুদ্রের পানিই নিঃশেষ হয়ে যাবে, আমার প্রভুর মহিমা–কীর্তন শেষ হবার আগেই। যদিও আমি আবার সব সমুদ্রের পানি কালি করে দিই তবু সব কালি ফুরিয়ে যাবে কিন্তু আমার প্রভুর মহিমা বর্ণনা শেষ হবে না।'

এই বিশ্বজগতে যত ধরনের সৃষ্ট পদার্থ রয়েছে সবই আল্লাহ্তালার সৃষ্টি শিল্প। জগতের সব সৃষ্ট পদার্থই অতি বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক। গোটা বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ, আসমান ও জমিনের প্রতিটি বালুকণা নিজ নিজ ভাষায় সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করছে। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের অসীম ক্ষমতা ও অনন্ত জ্ঞানের অবিরাম গুণ- কীর্তন করে চলেছে। আল্লাহ্তালা বলেন–'অইম্ মিন্ শাইয়িন ইল্লা ইয়ুসাব্ বিহু বিহামদিহি অলা কিল্লা তাফকাহুনা তাসবিহাহুম০' 'সৃষ্ট বস্তুর সব্বাই প্রশংসা করে চলেছে তাদের সৃষ্টিকর্তার। কিন্তু তোমরা তাদের প্রশংসার ভাষা বোঝনা।'

সৃষ্টিজগতের যেদিকে তাকাও সব কিছু অপার বিস্ময়ে ভরা। অবাক আর আশ্চর্যময়! জগতের বিস্ময়কর পদার্থ এতো অপরিসীম যে, কোনও বর্ণনাকারীই তা আলোচনা করে শেষ করতে পারবে না। এমন কি জগতের সব সমুদ্র, নদী ও জলাশয়ের পানি যদি লেখার কালি হয় এবং ভূ-পৃষ্ঠে জন্মানো সব বৃক্ষ–রাজি যদি কলম হয় আর জগতের সব প্রাণী যদি লেখক হয় আর অনন্তকাল ধরে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের গুণ–কীর্তন লিখতে থাকে তো সমস্ত পানি শেষ হবে, কলম নিঃশেষ হবে, প্রাণীরা মরে যাবে তবুও তাঁর প্রশংসা ও মহিমা, বিচিত্র সৃষ্টি কৌশল ও বিস্ময়কর শিল্প নৈপুণ্যের যথার্থ অবস্থা খুব সামান্যই লিখতে পারবে।

আল্লাহ্তালার বিচিত্র সৃষ্টি ও মহিমার কোনও পার না থাকলেও; সৃষ্ট বস্তুকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। তার মাঝে এক দল সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। এ ব্যাপারে আল্লাহ্তালা বলেন–

'সুব্হানাল্লাজি খালাকাল আজওয়াজা কুল্লাহা মিম্মা তুম্বিতুল আরদু অমিন আনফুসিহিম অমিম্মা লাইয়ালামুন০' 'আল্লাহ্তালা পবিত্র, যিনি সমস্ত বস্তুকে বিপরীত জাতীয় জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন–জমিন থেকে উদ্ভূত উদ্ভিদ এবং মানব জাতিকেও। আর সেই সব বস্তুকে যার সম্পর্কে মানুষ জানে না।'

আর এক ধরন সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। যে ভাগটির ব্যাপারে আমরা জানতে পারি তার আবার দু'টো রকম। এক রকম আমরা চোখে দেখতে পাই না। যেমন–আর্শ, কুরসী, ফিরিশতা, দৈত্য–দানব, জ্বিন–পরী। এই শ্রেণী সম্পর্কে চিন্তা করার ধারা খুব কঠিন। আর যে ধরনের সৃষ্টি আমরা চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, সে সম্পর্কে আমাদের আলোচনা।

যে সব বিচিত্র সৃষ্টি বাইরের চোখ দিয়ে দেখা যায় তা এই–আসমান, সূর্য, চাঁদ, তারা,ও অন্যান্য গ্রহ–উপগ্রহ। ভূমন্ডল ও এর ভেতরের যাবতীয় পদার্থ। যেমন–পাহাড়, পর্বত, অরণ্য, সমুদ্র শহর, বন্দর। পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত মণিমাণিক্য, ভূগর্ভস্থ খনিজদ্রব্য। নানা জাতের উদ্ভিদ।

আর মানুষ ছাড়া নানাধরনের স্থলচর, জলচর, খেচর ছোট বড় সব প্রাণী রয়েছে। এসব প্রাণীও পদার্থ সম্পর্কে চিন্তা করতে করতে শেষ পর্যন্ত নিজ সত্ত্বা ও অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা করতে পারে। মানুষই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বিচিত্র ও বিস্ময়কর সৃষ্টি। আল্লাহ্তালা বলেন, 'অ তুখ্রিজুল হাইয়্যা মিনাল মাইয়্যিতি, অ–তুখ্রিজুল মাইয়্যিতা মিনাল হাইয়্যি।' অর্থাৎ আমি জীবনের ভিতর মরণকে প্রবেশ করাই; মরণের ভিতর থেকে বের করে আনি জীবনকে।'

প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ গোটা মানবসমুদ্র ও জীব জগতে মৃত্যু হানা দিচ্ছে। স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে জীবন। এটাতো স্থূল দৃষ্টিতেই আমরা দেখি। কিন্তু 'অতুখ্রিজুল মাইয়্যিতা মিনাল হাইয়্যি–' অর্থাৎ মরণের ভিতর জীবনকে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করছেন? এটা সূক্ষ্ম দৃষ্টি দেখছে। সূর্য, তার আলো। আপাতঃদৃষ্টিতে মৃত বা মরা। চাঁদের কিরণ! সেও মরা। মরা মাটি, মরা বীজ। সেখান থেকে মরা ফসল। মরা সীম, শাক, আলু, কফি, শালগম, গাজর, পিয়াজ, রসুন, আদা, মরিচ, লেবু, শসা, টমেটো ও অন্যান্য। মরা মাছ। মরা গোশ্ত। এগুলো রান্না করা হচ্ছে আগুনে। মরা জড় পদার্থে (কড়াই, হাঁড়ি)। এগুলো মানুষ খাচ্ছে, পান করছে।

হজম হচ্ছে; বর্জ্য পদার্থ পেসাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তৈরি হচ্ছে রক্ত। হৃদপিন্ডের সঙ্কোচন ও প্রসারণের কারণে রক্ত সারা শরীরে ছুটো ছুটি করছে। তৈরি হচ্ছে সৃষ্টির অপার বিস্ময় বীর্য। বীর্যও মরা। কিন্তু এক আনন্দঘন রাত্রিতে পিতা–মাতার মিলনে মরা বীর্য প্রবেশ করছে মা'র জরায়ু থলিতে। আল্লাহ্তায়ালা বলেন, 'আওলাম ইয়ারাল ইনসানা আন্না খালাক্নাহু মিন্ নুত্ফাতিন্ ফাইজা হুয়া খাসিমুম্ মুবিন।' অর্থাৎ 'মানুষ কি জানে না। যে তাকে এক ফোঁটা নাপাক পানি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে তবুও তারা তর্কবিতর্ক করে।' অন্য জায়গায় আল্লাহ্তালা বলেন, 'আফরাআইতুম মা তুমনুন; আ আনতুম তাখ্লুকুনাহু, আম নাহনুল খালিকুন।' 'তোমাদের ভেতর থেকে যে ছিটকে আসা পানি বেরিয়ে আসে, দেখেছো? ওগুলো কি তোমরাই তৈরি করো, না আমি তৈরি করে দিই?'

তো মরা বীর্য ঠাঁই পায় পিতার পিঠে।, মা'র বুকে। তারপর সেই পানি বিন্দুকে জন্মলাভের বীজ স্বরূপ করে দিয়েছেন। পিতা ও মাতার কামভাবকে প্রবল করে দিয়েছেন। রমণীর গর্ভাধারকে খেতস্বরূপ আর পিতার পিঠের পানিকে বীজ সদৃশ করেছেন। পিতা ও মাতার শুক্র যখন গর্ভে এসে মিলিত হলো, তখন তার নাম করা হলো 'নুতফাহ্'। গর্ভ সঞ্চার হওয়ার সাথে সাথেই গর্ভবতীর ঋতু রক্ত নিয়ে নুত্ফাহ্ ধীরে ধীরে বড় হয়ে রক্ত পিন্ডের আকার নেয়। এই অবস্থার নাম হলো 'আলাকাহ্'। কিছুদিন পর সেই রক্তপিন্ড 'মুয্গাহ্' অর্থাৎ মাংস পিন্ডাকারে রূপ নেয়। সেটা ধীরে ধীরে মানুষের আকার নেয়। হাড়, মাংসপেশী আসে। তারপর আচমকাই একদিন তাতে জীবন দান করেন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। আল্লাহ্ বলেন, 'ইয়াশ আলুনাকা আনির রুহ্'– 'তারা জিজ্ঞেস করছে, রুহ কী?' আপনি বলে দিন,'কুলির রুহ্ মিন আম্রি রাব্বি'–'রুহ হচ্ছে আল্লাহ্ তালার একটা আদেশ মাত্র।'

এই তিনটি চল্লিশ দিনে তিনটি পর্যায় অতিক্রম করার পর প্রাণ আসে। তো সূর্যের আলো, চাঁদের কিরণ, মাটি, বীজ, ফসল, শাকসব্জি, মাছ, মাংস, রক্ত, বীর্য, শুক্র–এতসব মৃত জিনিস থেকে জীবনের সাড়া দেন?

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন।

মানুষের সৃষ্টিই হচ্ছে সবচেয়ে বিস্ময়কর। এছাড়া ভূমন্ডল ও আসমানের মধ্যবর্তী মহাশূন্যে অবস্থিত মেঘ, বৃষ্টি, শিলা, বজ্রপাত, মেঘগর্জন, বিদ্যুৎ, রঙধনু আর বায়ু প্রবাহের পরিবর্তন দেখার বিষয়। এসবই আল্লাহ্ তা'লার অমিত ক্ষমতা ও অপার মহিমার নির্দশন। তাঁর গৌরব ও প্রতাপের পরিচয়।

আল্লাহ্তায়ালা মানুষকে নির্দেশ দিচ্ছেন–'অকাআইয়্যিম মিন আয়াতিন ফিস সামাওয়াতি অল আরদি ইয়ামুদ্দুনা আলাইহা অহুম আনহা মু'রিদুন।'

'আসমান ও জমিনের মাঝে অনেক নির্দশন তাদের চোখের সামনে দিয়ে চলে যায় কিন্তু ওরা তা খেয়ালই করেনা; তারা বড়ই উদাসীন।'

আল্লাহ্ তাবারাকওয়া তায়ালা আরো বলেন, 'আওলাম ইয়ানজুরু ফি মালাকুতিস সামাওয়াতি অল আরদি অমা খালাকাল্লাহু মিন শাইয়িন।'

'তারা কি আসমান আর ভূপৃষ্ঠের রাজ্যগুলো সম্পর্কে এবং আল্লাহ্তায়ালা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার মাঝে যা কিছু আছে তা নিয়ে চিন্তা করছে না?'

তিনি আরো বলেন, 'তুসাব্বিহু লাহুস সামাওয়াতিস সাবউ অল্ আর্দু অমান্ ফিহিন্না।'

'সাত আসমান ও সাত জমিনের মাঝে যা কিছু আছে সবই তার প্রশংসা ও গুণকীর্তনে মগ্ন রয়েছে।'

আল্লাহ্তালার অপার মহিমার প্রথম নির্দশন হচ্ছে মানুষ নিজেই।

এক ফোঁটা শুভ্ররং পানির সাথে রক্ত মিশিয়ে আর তাদের মিলনে দেহে কত ধরনের বিচিত্র পদার্থ যেমন–মাংস, চামড়া, শিরা, স্নায়ু ও হাড় ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছে। এই সব পদার্থের সহযোগিতায় কেমন সুঠাম, সুশ্রী অবয়ব তৈরি করেছেন। গোলাকার করেছেন মাথা, হাত–পা গুলো লম্বা লম্বা। ওগুলোর সামনের দিকে পাঁচটা করে আঙুল। দেহের বাইরের দিকে

চোখ, নাক, কান, মুখ, ঠোঁট, জিহ্বা। এছাড়া অন্য সব অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গগুলো ঠিক ঠিক মতো সাজিয়ে দিয়েছেন।

দেহের ভেতরের দিকে প্রতিটি অঙ্গের আকার, প্রকার ও পরিমাণ আলাদা। প্রতিটির আকার, আয়তন আলাদা আর কাজও ভিন্ন। এসব প্রধান অঙ্গগুলোকে ভাগ করেছেন ক'টি ছোট ছোট অংশে।

প্রতিটি আঙুলে তিনটি করে 'পোর' (দুই গিরার মাঝের অংশ)। কিন্তু বুড়ো আঙুলের ক্ষেত্রে আবার অন্যরকম। সেখানে 'পোর' রয়েছে দু'টো। হাত ও পা উভয়েই।

প্রতিটি অঙ্গকে সৃষ্টি করেছেন মাংস, চামড়া, শিরা, স্নায়ু ও অস্থি দিয়ে।

চক্ষু-গোলকটি সুপারী আকারের। তাতে রয়েছে সাতটা আলাদা স্তর। প্রতিটি স্তরের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা আলাদা। এর যে কোনও একটা স্তরের ক্ষমতা বা কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে গেলেই গোটা দুনিয়া আঁধার হয়ে যায়। কোন কিছুই আর দেখতে পাওয়া যায় না।

এরপর দেহের মাঝের হাড়গুলোর ব্যাপারে গভীরভাবে দেখুন-সূক্ষ্ম ও তরল পানি থেকে কেমন কঠিন ও মজবুত পদার্থ তৈরি করেছেন। প্রতিটি খন্ড ও গিরার আকার ও আয়তন আলাদা। কোনটা গোলাকার, কোনটা লম্বা। কোনও অংশ চওড়া, কোনও খন্ডের ভেতরে ফাঁকা। কোনটা আবার নিরেট, দৃঢ়। কিন্তু অস্থিগুলো আলাদা আকার, অবস্থা ও আয়তনের হলেও তাদের সবগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত করে রাখা হয়েছে। অস্থিগুলোর প্রতিটির আয়তন, গঠন ও আকারের মধ্যে এক একটা আলাদা উদ্দেশ্য ও কৌশল রয়েছে। কখনও একটির মাঝে অনেক উদ্দশ্যে নিহিত আছে। দেহ-ঘরের খুঁটি হিসেবে অস্থিগুলোকে তৈরি করা হয়েছে। এগুলোর ওপর যাবতীয় অঙ্গের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে।

অস্থিগুলো যদি গিরা ও জোড়া বিশিষ্ট না হয়ে একটানা বিশাল হাড়ের আকারে সৃষ্টি করা হতো তাহলে পিঠ বাঁকানো বা নত করা সম্ভব হতো না। আবার যদি দেহের হাড়গুলো পরস্পর সংযুক্ত না হতো তাহলে পিঠ সোজা করা, পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানো যেতো না। কাজেই এই দু'ধরনের অসুবিধে দূর করতে অস্থিগুলোকে টুকরো টুকরো করে সৃষ্টি করেছেন। যাতে দেহের প্রতিটি অংশকে আমরা ইচ্ছে মতো বাঁকাতে বা নোয়াতে পারি।

আবার অস্থিগুলোকে পরস্পর ধমনী ও শিরার সাহায্যে সংযুক্ত করে পাতলা পর্দার আবরণে জড়িয়ে মজবুত করে দিয়েছেন, যেন তাদের ওপর ভর করে দাঁড়াতে পারে। প্রতিটি অস্থি টুকরোর এক দিকে চারটি করে গোল বর্তুলাকার দাঁত এবং অন্য দিকে ওই চারটা দাঁত ঢুকে বসতে ও নড়তে পারে এমন চারটা গর্তাকৃতি খাঁজ রয়েছে। এক প্রান্তের বর্তুলগুলো অন্য প্রান্তের গর্তাকারের খাঁজগুলোর মধ্যে ঢুকে সমানে সমান বসানো রয়েছে। যেন বাঁকা ও সোজা করার সময় প্রয়োজন মতো ঘুরতে পারে। অস্থিখন্ডের প্রান্তভাগের গোলাকার হাড়গুলো বের করে রাখা হয়েছে কনুইএর হাড়ের মতো। তাতে পেশী, শিরা, উপশিরা যেগুলো হাড়ের ওপর জড়িয়ে আছে সেগুলো আড়াআড়ি ভাবে থেকে হাড়ের সংযোগকে দৃঢ় রাখতে পারে।

এভাবে মাথার খুলি পঞ্চান্নটি হাড়ের টুকরোর সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে। ওগুলোকে পরস্পর জুড়ে দেয়া হয়েছে সূক্ষ্ম সেলাইয়ের সাহায্যে। এসব সংযোগের মাঝে অতি সূক্ষ্ম ফাটল রয়েছে। তাতে খুলির কোনও এক অংশে ব্যথা বা ক্ষত সৃষ্টি হলে তা অন্য ভাগে পৌঁছুতে পারে। তাই অন্য অংশগুলো নিরাপদে থাকে। এক অংশের উপর কোনও আঘাত লাগলে সেই অংশেই কষ্ট হয়। অন্য অংশগুলো নিরাপদ থাকে।

দাঁতের সৃষ্টি কৌশল সম্পর্কে চিন্তা করলে আরও অবাক হতে হয়।

কতগুলো দাঁতের আগা গোল ও চওড়া। এতে খাদ্যবস্তু চিবিয়ে খাওয়ার সুবিধে হয়। আর কতগুলো দাঁতের আগা পাতলা ও ধারালো। এগুলোর সাহায্যে খাদ্যবস্তুকে কেটে ছোট ছোট টুকরো করে পাশের চওড়া মাথা দাঁত গুলোর দিকে ঠেলে দেয়া হয়। চওড়া দাঁত কাটা টুকরো গুলোকে চিবিয়ে জিহ্বার সাহায্যে পাকস্থলীতে চালান দেয়। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন

হজমের জন্যে এই সুব্যবস্থা করেছেন। কী নিখুঁত তার সৃষ্টি। ছোট খাটো কোনও দিক তাঁর কুদরতি দৃষ্টি থেকে এড়ায় নাই।

এবার আসা যাক গ্রীবা দেশের বিচিত্রতার দিকে।

সাত টুকরো হাড়ের সংযোগে সৃষ্টি করা হয়েছে। সেগুলোকে মজবুত ও শক্ত করে দিয়েছেন শিরা, ধমনী ও স্নায়ু দিয়ে জড়িয়ে। গলার ওপর দিকের সাথে সংযুক্ত করেছেন মাথাকে। পিঠের মেরুদন্ডটিকে চব্বিশ টুকরো হাড়ের সংযোগে সৃষ্টি করে তার ওপর দিকে গ্রীবা বা গলদেশ স্থাপিত করেছেন। মেরুদন্ডের হাড়গুলোর সাথে পাশের দিকে পাঁজর বা বুকের হাড়গুলো এনে মিলিয়ে দিয়েছেন সুকৌশলে। এভাবে দেহের নানা জায়গায় আরও অনেক অস্থিখন্ড সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের সব কটার ব্যাপার আলোচনা করা দীর্ঘ সময়ের দরকার।

মোটামুটি, দেহ-পিঞ্জরের মাঝে দু'শো সাতচল্লিশটা অস্থিখন্ড বিভিন্ন উদ্দেশ্যে নানান জায়গায় নানা কৌশলে সংযুক্ত করা হয়েছে। যাতে মানুষ তার ইচ্ছেমতো কাজ করতে পারে। যাই হোক, লক্ষ্য করুন, এতো সব বিচিত্র পদার্থ এক ফোঁটা অপবিত্র ও নিকৃষ্ট পানি থেকে তৈরি হয়েছে। এগুলোর এক একটা খন্ড এতো দরকারী যে, এক টুকরো বিকল বা নষ্ট হয়ে গেলে সমগ্র দেহ বিকল হয়ে যায়। আবার যদি সুচারু সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে সাজানো শরীরের কোথাও একটা অস্থিখন্ড বেড়ে গেলে দেহের শান্তি ও আরাম হারাম হয়ে যায়।

যেহেতু বিভিন্ন কাজ করার উদ্দেশে অস্থিখন্ড ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো নড়া-চড়া ও সঞ্চালন করার প্রয়োজন হয়; সেজন্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর মধ্যে সর্বমোট পাঁচশো সাতাশটি 'আ'যালাহ' বা মাংসপেশী সৃষ্টি করেছেন। মাংস পেশীগুলো মাছ আকারের। মাঝখান চওড়া ও পুরু। আগার দিকে ক্রমশঃ পাতলা ও সরু। এদের গঠন ও আয়তন আলাদা। কয়েকটি বড় ও ক'টি ছোট। প্রতিটি পেশী গোশ্‌ত, ধমনী ও পাতলা পর্দা দিয়ে তৈরি। পর্দাগুলো চাদরের মতো ওদের জড়িয়ে আছে। পাঁচশো সাতাশ টা পেশীর চব্বিশ টা চোখের চারদিকে রয়েছে। এদের সাহায্যে সব দিক থেকে চক্ষুগোলক, ভ্রু ও পাতাকে ইচ্ছে মতো ঘোরানো যেতে পারে। দেহের সব জায়গার পেশীর উপকারিতা, কার্য ও উপযোগিতা আলোচনা করতে গেলে রাত ফুরিয়ে যাবে।

দেহের মাঝে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তিনটি কেন্দ্রস্থল তৈরি করেছেন। সেখান থেকে অনেক নালী, প্রণালী বা শাখা প্রশাখা বের করে দেহের নানা জায়গায় ছড়িয়ে দিয়েছেন।

পয়লা কেন্দ্র মস্তিষ্ক।

এখান থেকে অনেক স্নায়ুসূতো নালী প্রণালীর মতো বের হয়ে দেহের নানা স্থানে জড়িয়ে রয়েছে। এদেরই সাহায্যে অনুভব শক্তি বা নাড়াচাড়ার ইচ্ছা মস্তিষ্ক দেশে উৎপন্ন হয়ে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। মস্তিষ্কের কেন্দ্র থেকে এক গোছা মোটা সাদা রঙের রগ নদীর মতো বের হয়ে মেরুদন্ডের অস্থিগুলোর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছেছে। মস্তিষ্ক থেকে বের হওয়া সেই নালী-প্রণালীর মতো স্নায়ুমন্ডলী যা গোটা শরীরে ছড়িয়ে রয়েছে তাদের সাথে ওই মেরু শিরাটির যোগাযোগ করে দেয়া হয়েছে। উদ্দেশ্যে এই যে, এর ফলে কোনও অঙ্গের স্নায়ু গুলো মস্তিষ্ক থেকে দূরে পড়বে না। বরং গোটা দেহের স্নায়ুমন্ডলীর সম্পর্কই মস্তিষ্ক কেন্দ্রের সাথে সমানভাবে জড়িয়ে থাকে। কোনও অঙ্গের স্নায়ু মস্তিষ্ক থেকে দূরে পড়লে সরবরাহের অভাবে ধীরে শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

দ্বিতীয় কেন্দ্র রক্তাধার বা কলিজা।

এখান থেকে অনেকগুলো রক্তবাহী শিরা ও উপশিরা বের হয়েছে। সেগুলো দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গে ছড়িয়ে ও জড়িয়ে রয়েছে। এসব শিরা-উপশিরার সাহায্যে রক্তাধারে পরিশোধিত খাদ্য-রস, গোটা দেহের পরিপুষ্টির জন্যে, প্রতিটি অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গে পৌঁছে যায়।

তৃতীয় কেন্দ্র অন্তকরণ বা হৃদপিন্ড।

এতেও অনেক ধমনী ও স্নায়ু রয়েছে। এগুলো কেন্দ্র থেকে বের হয়ে গোটা দেহের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এদের সাহায্যে জীবনী শক্তি হৃদপিন্ড থেকে বের হয়ে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দিকে প্রবাহিত হয়।

দেহের এক একটি অঙ্গ সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা করি যে এই অঙ্গটি আল্লাহতায়ালা কিভাবে আর কী উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন; তো অবাক বিস্ময়ে নিথর হয়ে মহান রাব্বুল আলামীনের সীমাহীন ক্ষমতা ও দয়া উপলব্ধি করতে পারি।

সাতটি স্তরে তৈরি করেছেন তিনি চোখকে। কেমন সুন্দর গঠন ও বিচিত্র আকৃতিতে! এর আর অন্য কোনও বিকল্প ছিল কি? চোখের স্থান যদি কপালের মাঝখানে হতো! এই চোখের সৌন্দর্য নিয়ে কতো কবি কতো আবেগময় কবিতা রচনা করেছেন। একেক মানুষের একেক ধরনের চোখ। কারো ছোট, কারো বড়। কারো ভ্রু বাঁকা তরবারির মতো। কারো মাঝখানে দ্বিখন্ডিত। একজন নারীর চোখের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কত পুরুষ পাগল হয়ে গেছে। চোখ যে আকর্ষণের অন্যতম অংশ তা আল্লাহতালা কালামে পাকেই বলেছেন। জান্নাতের হুরদের সৌন্দর্য কোটিগুণ বেড়ে যাবে তাদের আয়ত চক্ষুর কারণে। 'হুরুন্ ই'নুন কাআম্সালিল্ লুলু ইল্ মাকনুন' - 'তারা বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট ও মণি-মুক্তা সদৃশ হবে।' কাজল কালো চোখ, হরিণী চোখ। চোখের তারার আলোয় কতো নারী কতো দুর্ধর্ষ পুরুষ, দিগ্বিজয়ী যোদ্ধাকে ঘায়েল করে দিয়েছে। কতো রাজা তার রাজত্ব ছেড়েছে চোখের ইশারায়।

আল্লাহতালা চোখকে ধুলো-বালি ও খড়কুটো থেকে সুরক্ষা করার জন্যে চোখের পাতাকে ঢাকনি হিসেবে তৈরি করেছেন। সেই পাতার কিনারে কতগুলো সোজা কালো রঙের লোম সাজিয়েছেন। এগুলোকে পাঁপড়ি বলে। এগুলো একদিকে যেমন চোখের শোভা ও সৌন্দর্য বাড়ায় তেমনি দৃষ্টি শক্তি অনেক প্রখর করে। এছাড়া পাঁপড়িগুলো সোজা হবার কারণে ধুলো-বালি উড়লে সহজে চোখকে বন্ধ করে নেয়া যায়। তাতে তোমার চোখে ধুলো-কুটো পড়েনা। পাঁপড়ি সোজা ও কালো হওয়ায় ওগুলোর ফাঁক দিয়ে তুমি অনায়াসে সামনের দিকের সবকিছুই পরিষ্কার দেখতে পাও। কালো না হয়ে অন্য কোনও রঙের বা নিচের দিকে বাঁকা হলে তোমার দৃষ্টি বাধা পেতো। পাঁপড়ি গুলি সামনের দিকে সোজাভাবে ছাউনির মতো ঢাকা; এজন্যে ওপর থেকে খড়কুটা বা তেমন কিছু পড়লে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

চক্ষুগোলক আর তার সাথের জিনিসগুলো আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিচিত্র সৃষ্টি কৌশল ও আশ্চর্য শিল্প-নৈপুণ্য। কিন্তু এর চেয়ে আরও আশ্চর্য কারিগরী এবং অসীম ক্ষমতার নিদর্শন এই যে, চোখের মণি। এগুলো দু'তিনটে মসুর বীচের পরিমাণ। কিন্তু এর দেখার ক্ষমতা দিগন্ত বিস্তৃত গগনমন্ডল আর সুবিশাল ভূমন্ডল। আকাশ এতো ওপরে, এতো দূরে কিন্তু পলকে তা পরিষ্কার দেখে ফেলছে নয়ন মণি। একটুও দেরি হয় না। সামনের দৃষ্টিতে চোখের দেখার বিচিত্র ব্যবস্থা, আয়নায় ফুটে ওঠা ছবি দেখার অবস্থা, এছাড়া বাস্তব অবাস্তব আকার দেখার তথ্য বলতে গেলে সারা রাত ফুরিয়ে যাবে।

এবার কান সম্পর্কে ভাবুন।

আল্লাহ্তালা কানকে সৃষ্টি করে তার প্রবেশ মুখে এক ধরনের কটু-স্বাদের ময়লা সঞ্চিত থাকার ব্যবস্থা করেছেন। সেই কটু গন্ধ ও বিস্বাদ ময়লার জন্যে কোনও ধরনের কীট কানে ঢুকতে পারে না। আবার দেখুন কানের রন্ধ্র পথটা শামুকের উদর পথের মতো ঘোরালো করে তৈরি করেছেন। তাতে বাইরের শব্দ ওই প্যাঁচের মাঝে বাধা পেয়ে ধীরে প্রগাঢ় ও গম্ভীর হয়। শেষে উঁচু আওয়াজ কর্ণ-কুহরে ঢোকে। আকৃতিটি ফানেলের মতো হওয়ার কারণে শব্দ একসাথে প্রবেশ করে কানের পর্দার ক্ষতি করতে পারে না। রন্ধ্র পথটা প্যাঁচালো হওয়াতে ঘুমন্ত অবস্থায় পিঁপড়া বা পোকা একবারে শেষ মাথায় পৌছুতে পারে না। ঘোরানো পথ পেরুতেই তার পায়ের আওয়াজ পেয়ে আমরা জেগে উঠি। তারপর প্রতিরোধে সমর্থ হই।

এভাবে মুখ, নাক ও অন্যান্য বাইরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আলোচনা করলে কয়েক রাত কেটে যাবে। এসব সম্পর্কে নির্জনে চিন্তা ভাবনা করলে মহা বিজ্ঞানময় আল্লাহ্তালার শিল্পচাতুর্য, মহত্ব, দয়া, করুণা, জ্ঞান ও ক্ষমতার ব্যাপারে আমরা বুঝতে পারবো। আমাদের মাথা শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে তার প্রতি ঝুঁকে যাবে।

মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাঁর সৃষ্টি বৈচিত্রের আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর বিষয় তার অসীম ক্ষমতা, বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা মনে করে দেয়।

আল্লাহ্তায়ালা বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলেন 'অফি আনফুসিহিম আফালা ইয়ুবসিরুন।'

'তাদের নিজের অস্তিত্বের মাঝেও আল্লাহ্ তায়ালার অপার মহিমা ও মহান ক্ষমতার বহু নির্দশন রয়েছে; তারা কি চিন্তা করে না?'

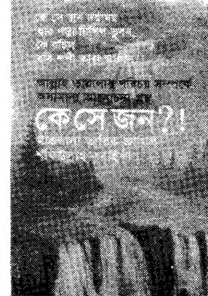
শরীরের মাঝে অন্যতম অঙ্গ চোখ। সারা দুনিয়ার বর্তমান মানব সংখ্যা ছ'শো পঁচিশ কোটি। ছ'শো পঁচিশ কোটি জোড়া চোখ। কোনও জোড়া চোখের সাথে অপর জোড়া চোখের রঙ, আকার, আয়তন ও সৌন্দর্যে মিল হবে না। কাকতলীয় ভাবে যদি কোনটির মিল হয়েও যায় তা এক আধটা। তারপরও খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে তাতে কোন না কোন অমিল পাওয়া যাবেই।

আরেকটি অঙ্গ হচ্ছে নাক। কারও নাক খাড়া, কারো বোঁচা, কারো টিকলো। ছ'শো পঁচিশ কোটি নাক আলাদা ভাবে চিহ্নিত করা যাবে।

তেমনি কান। কারো নিখুঁত, কারো জোড়া, কারো লতি বিচ্ছিন্ন, কারো লতি কানের সাথে সেঁটে গেছে। এমন মানুষও রয়েছেন যাঁর কানে শুধু দু'টো ফুটো!

তেমনি হাত, পা, আঙুল। সব আলাদা। স্রষ্টা এতোই দক্ষ, এতো বড় কারিগর, এমন নিপুণ আর নিখুঁত শিল্পী যে এতোগুলো মানুষের মাঝে মিল করে ফেলেননি। নিজের অক্ষমতার পরিচয় দেননি। এমন কোন ভাস্কর আছেন যাঁর সৃষ্টি এতো বিশাল। এতো বিভিন্নতা আর বৈচিত্রময় সৃষ্টি!

আঙুলে যে রেখা রয়েছে এতো সূক্ষ্ম। অথচ ছ'শো কোটি মানুষের বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ হস্তরেখাবিদ বা ছাপ বিশেষজ্ঞ আলাদা করতে পারবেন। কারো সাথে অন্যের মিল হবে না। কেয়ামত পর্যন্ত যতো মানব সন্তান আসবে সবার ছাপ আলাদা হবে।



পাঁচ

এবার আসুন দেহের ভিতরের ব্যাপারগুলোতে।

এটা আরও বেশি বৈচিত্র্যময় ও বিস্ময়কর। বিশেষ করে মস্তিষ্ক। তার ভেতরে তৈরি হয়েছে বোধশক্তি ও অনুভব শক্তি। এর চেয়ে আশ্চর্যজনক সৃষ্টি আর কিছুই হতে পারে না। বুকের রক্তাধার, ও শ্বাস-প্রশ্বাসের কারখানা ও পেটের মাঝের কাজগুলো আরো বৈচিত্রময়। মহামহিমান্বিত স্রষ্টা উদরের ভেতর পাকস্থলীকে ডেগচির মতো করেছেন। পেটের ভেতরের উত্তাপে পাকস্থলী সবসময় চুলোর ওপর রাখা পাত্রের মতো টগ্‌বগ করে ফুটছে। খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে পৌছা মাত্র সেই উত্তাপে পরিপাক হয়ে যায়। সেখান থেকে খাদ্যরস দেহের অন্যান্য অংশের দিকে যাবার জন্যে বের হয়ে পড়ে। পথে কলিজা বা রক্তাধারে পৌছুলে ওই খাদ্যরস রক্তে পরিণত হয়। তারপর প্রবাহিত হয়। পথে রক্ত পিত্তকোষের মাঝ দিয়ে যাবার সময় পিত্তকোষ তাকে সংশোধিত করে তার ফেনিল অংশ, যাকে পিত্ত বলা হয়, ছেঁকে রেখে

দেয়। সেখান থেকে এই সংশোধিত রক্ত 'তিল্লী' বা প্লীহায় পৌছুলে আবার সংশোধিত হয় এবং রক্তের তলানি বা গাদ প্লীহা নামের পাত্রে থেকে যায়। সংশোধিত রক্ত ফের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অভিমুখে ছুটতে থাকে। পথে যকৃৎ নামের যন্ত্রটি রক্তের মাঝের জলীয় অংশকে আলাদা করে মূত্রকোষের দিকে পাঠিয়ে দেয়। বিশুদ্ধ রক্ত গোটা দেহের সর্বত্র পৌছে তাকে সবল করে তোলে।

এভাবে স্ত্রীলোকের পেটের বাচ্চাদানী এবং সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রগুলিও বিশেষ বৈচিত্র্যময় ও আশ্চর্যজনক। আবার দেহের বাইরের ইন্দ্রিয়গুলোর কর্মশক্তি আর ভেতরের যন্ত্রগুলোর শক্তি, যেমন-দর্শন, শ্রবণ, বোধশক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি যা আল্লাহতায়ালা মানুষকে দান করেছেন। তার প্রতিটি বিশেষ আশ্চর্যময় ও বিস্ময়কর। সুব্হানাল্লাহ্! মানব দেহকে মহা-মহিমান্বিত স্রষ্টা কেমন অপার মহিমা ও বিচিত্র শিল্প নৈপুণ্যে তৈরি করেছেন।

কোনও চিত্রকর আচমকা কোন প্রাচীরের গায়ে কিংবা বিশাল ক্যানভাসে একটা সুন্দর চিত্র আঁকলে তার দক্ষতায় বিস্মিত হয়ে আমরা পঞ্চমুখে তার প্রশংসা শুরু করি। কিন্তু বিশ্বস্রষ্টা এমন সুনিপুণ শিল্পী যে একবিন্দু পানি থেকে মানব দেহ সৃষ্টি করে তার বাহির ও ভেতর কেমন বিচিত্র কারুকার্য বিস্ময়কর ভাবে সাজিয়েছেন-তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার অবকাশও আজ আমাদের নাই। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চিত্রকরের হাত, কলম, তুলি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সবই দেখা যায়। কিন্তু সেই মহান, অলৌকিক বিশ্বশিল্পীর তুলি, কলম বা হাত কিছুই আমরা দেখতে পাই না। এমন মহামহিমান্বিত চিত্রকরের বৈচিত্র্যপূর্ণ ছবি দেখে তাঁর অসীম ক্ষমতা ও অপার মহিমার কথা ভেবে আমরা অবাক হইনা। এমন সুদক্ষ সুনিপুণ শিল্পীর অসীম ক্ষমতা ও অনন্ত জ্ঞানের কথা ভেবে আমরা কখনও স্তব্ধ, নিথর, দিশাহারা বা আত্মহারা হই না। তাঁর অসীম দয়া ও অপার করুণার কথা ভেবে আমরা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হই না।

যিনি মাতৃগর্ভে আমার প্রতি এমন করুণা বর্ষণ করেছেন যে, তখন আমি খাবারের মুখাপেক্ষী ছিলাম আর যদি ক্ষুধা নিবারণের জন্যে মুখ খুলতাম তাহলে তখনি অতিরিক্ত ঋতু-রক্ত মুখ দিয়ে পেটে ঢুকে আমাকে ধ্বংস করে দিত। কিন্তু তখন আমার ক্ষুধা নিবারণের জন্যে কতো সুন্দর ব্যবস্থা করেছিলেন দয়ালু প্রতিপালক মহান রাব্বুল আলামীন। মুখ বন্ধ করে দিয়ে নাভিপথে নিতান্ত প্রয়োজন পরিমাণ খাদ্যরস পেটে পৌছে দিয়েছেন তিনি। যখন ভূমিষ্ঠ হলাম তখন আবার নাভিপথ বন্ধ করে মুখ খুলে দিয়েছিলেন। কারণ তখন মুখ দিয়ে খাবার গ্রহণ করলে আর কোনও ভয় ছিল না। মা তার নিজের বিবেচনা মতো সন্তানের প্রয়োজনীয় খাবার খাইয়েছেন।

আরও দেখার বিষয়, শিশু অবস্থায় শরীর ও পরিপাক শক্তি দুর্বল ছিল বলে কঠিন খাদ্য খাওয়ার বা হজম করার শক্তি ছিল না। তখন দয়ালু আল্লাহতায়ালা মায়ের দুধের মতো তরল ও সহজে হজম হয় এমন খাদ্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেজন্যে ভূমিষ্ঠ হবার অনেক আগেই মা'র বুকে দুটো স্তন সৃষ্টি করেছেন। আর ঠিক জন্মলগ্নে ওই স্তনদুটোর মাঝে দুধ দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। যেন সদ্যপ্রসূত শিশুটির কষ্ট না হয়। সেই স্তন দু'য়ের বোঁটার আয়তন শিশুর মুখের হাঁ অনুযায়ী সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সেটা থেকে অতি সূক্ষ্ম অনেক নালী দিয়ে দুধ বের হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এমন ব্যবস্থা না করলে অতিরিক্ত দুধ শিশুর মুখে ঢলে পড়ে নষ্ট হতো। আল্লাহতায়ালা শিশুর মা'র বুকে এক ধারণাতীত শক্তি দান করেছেন যা ধোপার মতো কাজ করছে। কারণ যে সাদা রঙের দুধ বের হয়ে আসছে তা মা'র রক্ত ছাড়া আর কিছু না। মাতৃস্তনে লোহিত বর্ণের যে রক্ত এসে জমা হয়, বুকের ধোপার শক্তি তাকে ধুয়ে সাদা রঙের দুধে পরিণত করে। এছাড়া রক্তের স্বাভাবিক অপবিত্রতা দূর করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে শিশুর মুখে পাঠিয়ে দেন।

আবার দেখুন,

যখন আমি জন্ম নিলাম তখন আমার মা যে কষ্ট পেয়েছে তা মৃত্যুকষ্টের কাছাকাছি। এমন মা'কে দেখা গেছে যে, প্রসব বেদনায় কাতর হয়ে বিছানা ছেড়ে ছুটে পালাতে চেয়েছে। অনেক মা তো মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে। প্রসব বেদনায় মুহ্যমান মা, তার বিছানার পাশে

এক বালতি রক্ত! কাজেই স্বাভাবিকভাবে এই মায়ের কাছে তার শিশুটি বড়ই অনাহূত। যে কষ্ট সে দিয়েছে তাতে অন্য কেউ হলে সে হতো তার জীবনের সবচেয়ে বড় দুশমন। কিন্তু স্রষ্টার অপার মহিমা যেখানে ঘৃণা, হিংসা, আর প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে ওঠার কথা। সেখানে শিশুটিকে দেখার সাথে সাথে সব যাতনা, সব বেদনা, সব ব্যথা, যন্ত্রণা আর কষ্ট মুহূর্তে উড়ে যায়। সেখানে জন্ম নেয় ভিন্ন এক অনুভূতি। তা হচ্ছে তীব্র মায়া! মমতা! মা পরম স্নেহে নাড়ী ছেঁড়া ধনটিকে বুকের মাঝে আঁকড়ে ধরে। সতর্ক হয়ে ওঠে তার দুর্বল শরীরের প্রতিটা স্নায়ু, প্রতিটা তন্ত্রী। কারণ শিশুটির নিরাপত্তা। পরম মমতার আধার করুণাময় আল্লাহতায়ালা তখনই তাঁর অসীম অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে বুকের অসংখ্য নালীর ভিতর দিয়ে বইয়ে দেন ঝর্ণা ধারা। সাদা, শুভ্র, পবিত্র অমিয়ধারা! কেঁদে ওঠা শিশুর মুখে ঠেলে দেয় স্তনের বোঁটা। শিশু শিউরে উঠে পরমানন্দে স্থির, নিথর হয়ে যায়।

ধীরে ধীরে শিশু বড় হয়।

মা মমতা, ভালবাসায়, অপত্য স্নেহে হয়ে ওঠে অন্ধ। দয়ালু আল্লাহ তাঁর দয়ার খাজানা থেকে ঢেলে দেন এই মায়া আর মমতা। শিশুর নিরাপত্তার জন্যে অতন্দ্র প্রহরী হয়ে ওঠে মা। মুহূর্তের জন্যে শিশু ক্ষুধার্ত হয়ে কেঁদে উঠলেই পড়িমড়ি ছুটে আসে আসে মা। অস্থির। ব্যাকুল। ছুটে এসে সাথে সাথে শিশুটিকে দুধ পান করায়।

দুধ পান করতে দাঁতের প্রয়োজন হয় না। কাজেই যতদিন শিশু দুধ পান করবে ততদিন তাকে দাঁত দেয়া হয় না। তখন মুখে দাঁত দিলে তা দিয়ে হয়তো সে তার মার বুক ক্ষত বিক্ষত করে দিত। সে জন্যেই শৈশবে বাচ্চার মুখে দাঁত বের হয় না। আবার যখন কঠিন খাবার খাওয়ার সময় হলো তখন শক্তিমতো ধীরে ধীরে দুটো চারটে করে দাঁত দেয়া শুরু হলো। শিশু দাঁতের সাহায্যে কঠিন খাবার চিবিয়ে খেতে পারলো।

যে ব্যক্তি এইসব বিচিত্র শিল্প নৈপুণ্য ও আশ্চর্যজনক সৃষ্টি-কৌশল দেখে তার সুদক্ষ শিল্পী ও সুনিপুণ সৃষ্টিকর্তার অণুপম শ্রেষ্ঠত্ব, অসীম ক্ষমতা ও অপার মহিমা চিন্তায় আত্মহারা না হয় তার চেয়ে অকৃতজ্ঞ, অজ্ঞান আর মূর্খ কে আছে?

স্রষ্টার পূর্ণ দয়া ও অপার করুণা এই সৃষ্টি বৈচিত্রের দেখে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে যদি সে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার বলে চিৎকার করে না ওঠে তাহলে তার চেয়ে উদাসীন ও হতভাগা আর কে আছে?

স্রষ্টার অপ্রতিহত প্রতাপ, অনুপম সৌন্দর্য, শিল্প নৈপুণ্য দেখে তাঁর প্রতি আসক্ত না হয়, অণুরক্ত না হয়, আত্মসমর্পিত না হয়, তার কাছে মাথা নত করে 'আস্‌লামতু লিরাব্বিল আলামীন' না বলে তবে তার চেয়ে অন্ধ, বিমুখ ও পথভ্রষ্ট আর কে আছে?

আর যে এসব সৃষ্টি রহস্য ও নৈপুণ্য নিয়ে চিন্তা করে না, নিজের দেহের মাঝের বিচিত্র কারিগরি সম্পর্কে জল্পনা কল্পনা করে না, যাবতীয় সৃষ্টির সেরা হিসেবে যে জ্ঞান, শক্তি আল্লাহ্ তায়ালা তাকে দান করেছেন তাকে কাজে না লাগিয়ে শুধু সময় নষ্ট করে তার চেয়ে দুর্ভাগা আর কে আছে?

যে মানুষ শুধু এটুকু জানে ক্ষুধা লাগলে আহার করতে হয়, রাগ হলে শত্রুর সাথে ঝগড়া ও মারামারি করতে হয়; কিন্তু আল্লাহতায়ালার মারেফাৎ বা পরিচয় জ্ঞান মনোহর উদ্যান ভ্রমণের নেয়ামত থেকে পশুর মতো বঞ্চিত থাকে-সে ব্যক্তি আকৃতিতে মানুষ হলেও স্বভাবে ও প্রকৃতিতে পশু। আল্লাহতালা থেকে সম্পূর্ণ অমনোযোগী ও সংসার মোহে মত্ত, উদাসীন। সম্ভবত তার সম্পর্কেই আল্লাহতায়ালা বলেন, 'অলাক্বাদ জারানা লি জাহান্নামা কাসিরাম্ মিনাল্ জিন্নি অল্ ইন্সি; লাহুম কুলুবুল্ লাইয়াফ্কাহুনা বিহা; অলাহুম আইউনুল্ লা ইয়ুবসিরুনা বিহা; অলাহুম আজানুল্ লা ইয়াশ্মাউনা বিহা; উলাইকা কাল্ আন্আমি বাল হুম আদাল; উলাইকা হুমুল্ গাফিলুন।'

'আর আমি সৃষ্টি করেছি দোজখের জন্যে অনেক জ্বিন ও মানুষকে। ওদের বিবেক আছে কিন্তু বিবেচনা করেনা। তাদের চোখ রয়েছে কিন্তু দেখে না। তাদের কান রয়েছে কিন্তু শুনতে পায় না। তারা চারপেয়ে পশুর মতো, বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট। এরাই হচ্ছে উদাসীন, অলস।'

আজ এখানে মানব দেহ সম্পর্কে যে আলোচনা করলাম তা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অপার বিস্ময়কর সৃষ্টি দেহতত্ত্বের আশ্চর্য বর্ণনার লক্ষ ভাগের এক ভাগও নয়। তা আলোচনায় আসা সত্যিই সুকঠিন।

নিজের দেহের বিচিত্র ও আশ্চর্যজনক ব্যাপারগুলোর চিন্তা শেষ করে যদি আরও এগুতে চাই তাহলে ভূমন্ডল সম্পর্কে ভাবতে পারি।

করুণাময় সৃষ্টিকর্তা কেমন সুন্দর করে জমিনকে পরিপাটি বিছানা আকারে আমার জন্যে সাজিয়েছেন; আল্লাহ্তালা বলেন-

'আলাম নাজআ'লিল্ আরদা মিহাদাঁও-'

'আমি কি করিনি জমিনকে বিছানা'?

জমিনকে আল্লাহ্তা'লা চওড়া করেছেন। এত বড় যে কেউ সারাজীবন চলতে থাকলেও তার শেষ সীমায় পৌঁছুতে পারবে না। তরল পদার্থ সমন্বিত ভূমন্ডলের উপরিভাগকে কঠিন পদার্থ করেছেন। তাতে পা ফেলে আমরা চলা ফেরা করতে পারছি।

'অল জিবালা আওতাদা-'

'এবং স্থাপন করেছি পর্বত মালা পেরেক স্বরূপ-'

অস্থির, চঞ্চল ও কম্পিত মাটির ওপর জায়গায় জায়গায় পাহাড়-পর্বত দিয়ে পেরেকের মতো পুঁতে তাকে স্থির করেছেন। ফলে তা নড়া চড়া করে না।

তিনি বলেন, 'অ আন্জালা মিনাল্ মু'সিরাতি মা'আন সাজ্ জাজা;'

'আমি জলভরা মেঘরাশি থেকে দিই প্রচুর বৃষ্টিপাত-'

তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি দিয়েছেন আর কঠিন পাথরগুলোর নিচ দিয়ে বের করেছেন মানুষের পিপাসা মেটানোর পানি। পাথরের চাপে বাধা পেয়ে পানি অল্পে অল্পে, ধীরে ধীরে বের হয়। কঠিন ও ভারি পাথরের চাপে যদি পানির বেগ বাধা না পেতো তাহলে একবারে বের হয়ে দুনিয়ার সমস্ত সমতল ক্ষেত্রকে ডুবিয়ে দিত। উদ্ভিদের জন্যে অল্প পানি শুষে নেয়া উপকারী। এতে ওগুলো ধীরে ধীরে পুষ্ট হতে থাকে। সেক্ষেত্রে পানি দিলে যদি একবারে বেরিয়ে এসে ফসলের ক্ষেত আর উদ্ভিদগুলোকে ডুবিয়ে দেয় তাহলে একবারেই সব বিনষ্ট হয়ে যেত।

এবার ঋতু সম্পর্কে আলোচনায় আসি।

প্রচন্ড শীতের প্রকোপে জমিন মরে ফেটে চৌচির হয়ে যায়। বর্ষার আগমণে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হলেই সেই মরা ও শক্ত মাটি কেমন সজীব ও সরস হয়ে ঘাস, ফসল আর ফলে ফুলে সুশোভিত হয়ে ওঠে। হরেক রঙের ফুলের শোভায় ভূপৃষ্ঠ সাতরঙা রেশমি পোশাকের মতো সুন্দর ও সুদৃশ্য হয়ে ওঠে। সাত রঙ বলবো কেন? হাজার রঙের নকশা পায়। তখন অনেক রকমের উদ্ভিদ বিচিত্র কারুকার্য নিয়ে উৎপন্ন হয়। তাদের কোনটায় ফুল ফুটে রয়েছে, কোনটির শাখায় ঝুলে রয়েছে কলি। ফোটা, আর অর্ধ প্রস্ফুটিত প্রতিটি ফুলের আকার ও রঙ আলাদা। একটার চেয়ে অপরটি বেশি সুন্দর। কোনটা রঙে, কোনটা সৌরভে। কোনটি আবার দেখতে বেশি মনোহর, বেশি মুগ্ধকর।

তারপর নানা ধরনের ফল ও তাদের গাছ রয়েছে। তাদের সুন্দর আকার, স্বাদ, সৌরভ ও উপকারিতা আলাদা। হাজার ধরনের উদ্ভিদ ভূপৃষ্ঠ ভেদ করে উঠে আসছে যাদের নাম চিহ্ন পর্যন্ত আমরা জানি না। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'আফারাআয়তুম্ মা তাহ্রাসুন; আ আন্তুম তাজরিউনাহু আম্ নাহনুজ্ জারিউন্।' 'তোমরা যে বীজ বপন করো তা দেখেছ কি? তোমরা তা উৎপন্ন করো না আমি করি?'

বীজ থেকে উৎপাদিত ফসলের মাঝে আল্লাতায়ালা দুর্লভ গুণাবলী সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তার মধ্যে কিছু কটু, কিছু মিষ্টি, কিছু টক। কোনটার এমন ক্রিয়া যে মানুষের দেহে অসুখ সৃষ্টি করে। আবার কতগুলোর গুণ এমন যে, রোগ দূর করে মানব দেহকে সুস্থ ও সবল করে তোলে। কোনটার গুণ এমন মহৎ যে, মরণাপন্ন ব্যক্তিকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে। আবার কিছু এমন জঘন্য যে প্রাণ কেড়ে নেয়। কোনটা পিত্ত বৃদ্ধি করে, কিছু পিত্তের প্রাবল্য দূর করে শরীরকে সুস্থ করে দেয়। কোনটা দুষিত কফকে স্নায়ুমন্ডলীর ভেতরের

রক্ত থেকে বের করে রক্তকে পরিষ্কার সুস্থ করে দেয়। কোন উদ্ভিদের প্রতিক্রিয়া গরম, কোনটি শীতল। কোন তরুলতা মস্তিষ্কের শুষ্কতা বৃদ্ধি করে দেয়, কোনটা আবার আর্দ্র করে তোলে। কোনও গাছড়ার ক্রিয়ায় ঘুম উড়ে যায়, কোনটা আবার নিদ্রায় অভিভূত করে ফেলে। কোনও উদ্ভিদের গুণে মনে আনন্দ বেড়ে যায়; কোনটি আবার মনের দুঃখ ও বিষন্নতার কারণ হয়। কোনও উদ্ভিদ মানুষের খাবার, কোনটি আবার পশু-পাখীর।

হাজার হাজার ধরনের উদ্ভিদ আছে। তার মধ্যে হাজার ধরনের সৃষ্টি-বৈচিত্র্য রয়েছে। এসব নিয়ে চিন্তা করলে আমরা এমন এক অসীম শক্তির সন্ধান পাবো যে, সেই শক্তির সীমা পরিসীমা মাপতে গিয়ে গোটা বিশ্বের সমস্ত মানুষ দিশাহারা ও আত্মহারা হয়ে যাবে। সেই মহান ক্ষমতাধর সূক্ষ্মদর্শী সুনিপুণ শিল্পীর সৃষ্টি কৌশল ও ক্ষমতা নির্ণয় করা অসম্ভব। আল্লাহু আকবার!

মহা মূল্যবান খনিজ পদার্থসমূহ যা আল্লাহ তা'আলা পার্বত্য এলাকা ও ভূগর্ভে আমানত রেখেছেন। যে সব জায়গায় এসব পদার্থ আল্লাহ তায়ালা লুকিয়ে রেখেছেন সেগুলোকে খনি বা আকর বলে। এই খনিজ পদার্থ গুলোর মাঝে কতগুলো মানব দেহের সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য আর কিছু তাদের সুখ-শান্তি বিধানের জন্যে। যেমন-সোনা, রূপা, মণি, হীরা, ফিরোজা, ইয়াকুত ইত্যাদি। আর কতগুলো তৈজসপত্র তৈরি করায় লাগে। যেমন-লোহা, তামা, পিতল, কাঁসা, রাঙ ইত্যাদি। আর কতগুলো বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। যেমন-লবণ, গন্ধক, আলকাতরা ইত্যাদি। এর মাঝে লবণ সবচেয়ে সুলভ ও সাধারণ পদার্থ। এর সাহায্যে খাদ্য-দ্রব্য পরিপাক হয়। কোন বস্তি বা জনপদে লবণের অভাব ঘটলে সেখানের সব রকম খাবার বিস্বাদ ও দুষ্পাচ্য হয়ে যায়। লবণ ছাড়া খাবার খেয়ে মানুষ পীড়িত হয়ে পড়ে এবং মৃত্যুর মুখোমুখি হয়।

কাজেই দয়ালু আল্লাহ্তালার দয়া ও করুণার প্রতি দেখুন-তিনি শুধু খাবার দেন নি। সেই খাবারে রুচি ও স্বাদ আনার জন্যে লবণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বৃষ্টির পবিত্র ও নির্মল পানি থেকে আল্লাহতালা তোমাদের জন্যে লবণ সৃষ্টি করেছেন। বৃষ্টির পানি ভূ-গর্ভে সঞ্চিত হয়ে আল্লাহতালার নির্ধারিত নিয়মে লবণে পরিণত হয়। এর চেয়ে অভাবনীয় ও বিস্ময়কর ব্যাপার আর কি আছে? আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'ইন্না জা আলনা মা আলাল আরদি জিনাতাল্লাহা।,' 'আমি ভূ-পৃষ্ঠের যাবতীয় জিনিস তৈরি করেছি পৃথিবীর সৌন্দর্যের জন্যে।'

এরপর রয়েছে ভূ-মন্ডলের সবরকম জীব-জানোয়ার, পশু-পাখি ও ইতর প্রাণী। এদের কিছু মাটির ওপর চলে, কিছু উড়ে বেড়ায়, কিছু দু'পেয়ে আর কিছু চার পায়ে ভর দিয়ে চলে। উড়ন্ত পাখি, পোকা আর রয়েছে ভূগর্ভে বাসকারী বিভিন্ন ধরনের কীট। এদের আকার, চরিত্র ও জীবন যাপন পদ্ধতি আলাদা। এক ধরনের প্রাণীর চেয়ে অন্যদল উত্তম। এদের জীবন ধারণ ও আত্মরক্ষার জন্যে যা প্রয়োজন পরম করুণাময় স্রষ্টা আল্লাহতায়ালা সব কিছুই এদের দান করেছেন।

প্রাণীগুলোর প্রত্যেকের জীবনযাপন, সন্তান লালন-পালন ও বাসস্থান নির্মাণের কৌশল ও নিয়ম শিখিয়ে দিয়েছেন। তার সাহায্যে তারা জানতে পেরেছে, কি উপায়ে জীবিকা অর্জন, কি পদ্ধতিতে নিজের আবাস তৈরি আর কি পদ্ধতিতে সন্তান প্রতিপালন করতে হয়।

সৃষ্টজীবের মাঝে সবচেয়ে ছোট প্রাণী পিপীলিকার প্রতি লক্ষ্য করে দেখি-তারা কেমন দক্ষতা আর দূরদর্শিতার সাথে এক নির্দিষ্ট সময়ে অবিরাম মেহনত করে গোটা বছরের খাবার সংগ্রহ করে রাখে। গমের বা ধানের বীজ পেলে তার দূরদর্শিতা দিয়ে বুঝে নেয় এটা আস্ত রাখলে কীট উৎপন্ন হয়ে শস্য খেয়ে ফেলবে-কেবল খোসা পড়ে থাকবে। সেজন্যে ওটাকে তারা দু'টুকরো করে রাখে। তাতে কোনও বীজ নষ্ট হয় না। আবার ধনে-বীজ পেলে তারা জানে এটাকে গোটা না রাখলে বিনষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই তাকে টুকরো না করে গোটা রেখে দেয়।

মাকড়সার দিকে একবার লক্ষ্য করেন, কেমন অভিনব কৌশলে সে নিজের ঘর তৈরি করে! নির্মাণ কাজে তার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ। ঘর তৈরিতে সূক্ষ্ম কাজগুলোর ওপর রাখে খেয়াল। তার নিজ মুখ থেকে বের হওয়া লালা দিয়ে তৈরি করে নেয় সূতা। একটা কোণ ঠিক করে

নেয়। এক দিকের দেয়ালের গায়ে সেই লালা দিয়ে তৈরি সূতো জমায় ভিত হিসেবে। তারপর অপর দিকের দেয়ালে নিয়ে যায়। এই কৌশলে প্রথমে টানার সূতোগুলো গেঁথে নেয়। এগুলো গাঁথা হয়ে গেলে তার উপর দিয়ে 'বানা' বা বুনটের সূতো চালিয়ে দেয়। দু'দিকের সূতো পারস্পরিক দূরত্ব সমান রাখে। জালের কামরাগুলো কোন জাগায় ঘন, কোন জায়গায় পাতলা করে না। একসূতো থেকে অপর সূতোর ফাঁক সমান রাখে। তাতে জাল দেখতে খুব সুন্দর হয়। শেষমেশ মাকড়সা দুই দেয়ালের কোণে মশা মাছি ইত্যাদি শিকার ধরার অপেক্ষায় একটি সূতোর সাথে ঝুলে পড়ে ওৎ পেতে থাকে। এই শিকার ধরেই মাকড়সা নিজ জীবিকা সংগ্রহ করে থাকে। এর মাঝে কোনও মশা বা মাছি জালে পড়লে মাকড়সা খুব দ্রুতগতিতে এসে ওই শিকারকে আক্রমণ করে। যে সূতোটার সাথে সে ঝুলেছিল সেটা দিয়ে শিকারের হাত জড়িয়ে বেঁধে ফেলে। আষ্টেপৃষ্ঠে। তাতে শিকারটি আর পালিয়ে যাবার সুযোগ পায় না। তখন তাকে ভান্ডারে জমা রেখে আবার নতুন শিকারের খোঁজে বসে থাকে। সতর্ক, সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে।

মৌমাছিগুলোর কাজ দেখুন–

ওরা কেমন সুন্দর কৌশল ও দক্ষতার সাথে নিজেদের বাসগৃহটিকে সমান ছয় কোণ বিশিষ্ট করে তৈরি করে। ঘরখানি যদি সম–ছয় কোণ বিশিষ্ট না করে সম–চতুষ্কোণ হতো তাহলে তাদের গোলাকার দেহ ফাঁকগুলো দখল করতে পারতো না। অনেকটা জায়গা বেকার পড়ে থাকতো। আবার যদি ঘরটি গোল হতো তাহলে ঘরগুলোর মাঝে অনেক বেশি ফাঁক থাকতো। সেক্ষেত্রে মৌচাক বৃথা হয়ে যেত। গোলাকার প্রাণীর জন্যে সম–ছয়কোণ বিশিষ্ট কোঠার মতো সামঞ্জস্যপূর্ণ আর কোন কিছু হতে পারে না। অথচ সম–ছয়কোণ বিশিষ্ট কোঠার আয়তন গোলাকার কামরার চেয়ে কম। এটা জ্যামিতি শাস্ত্র প্রমাণ করেছে। কাজেই মৌমাছি নিজের বাসগৃহ এমনভাবে তৈরি করে যাতে একটু স্থানও নষ্ট না হয়। চিন্তা করে দেখুন, এই ছোট প্রাণীর ওপর বিশ্ব–প্রভু আল্লাহ্ তা'লার কেমন অপার করুণা! তিনি কেমন সুন্দরভাবে বাসগৃহ নির্মাণের কৌশল এদের হৃদয়ে সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

মৌমাছি।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিচিত্র সৃষ্টির মাঝে আশ্চর্য এক প্রাণী।

খুবই ছোট আকারে। কিন্তু বুদ্ধিমত্তায় সে যে কোনও শিক্ষিত মানুষকে হার মানায়। তার কাজ কি? কিভাবে সে জীবন যাপন করবে সবই দয়ালু আল্লাহ্ তায়ালা তাকে শিখিয়ে দিয়েছেন। মৌমাছিকে দেখে আমরা একজন প্রকৌশলীকে মনে করতে পারি। আর সেই প্রকৌশলী সাধারণ কেউ নয়; অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার মেধাবী, অসাধারণ একজন প্রকৌশলীর বুদ্ধির দীপ্তি তার ভেতর দেখতে পারি।

আবার মৌমাছির কর্মপ্রণালী দেখে একজন তীক্ষ্ণধি চিকিৎসককে কল্পনা করতে পারি।

মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে।

ফুলের রস থেকে।

মধুর ভেতর মহা কৌশলী বিজ্ঞানময় আল্লাহ্তায়ালা মানুষের জন্যে রেখেছেন সুস্থতা। মৌমাছির জীবন–যাপন প্রণালী দেখলে দিশাহারা হয়ে যেতে হয়। বাসস্থান তৈরির কৌশলে, সেখানে অবস্থানের নিয়ম শৃঙ্খলায়, বাসা তৈরির পরিকল্পনায়, নিজেদের নিরাপত্তা ব্যবস্থায়, ফুল থেকে রস সংগ্রহ করায়–সবখানে তাদের শৈল্পিক নৈপুণ্য ও বুদ্ধির ছটা দেখতে পাওয়া যায়।

তারা কোথাও শিখলো এই লেখা–পড়া? স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের পাঠশালায়। ফুলের খোঁজে বের হয় মৌমাছি। রস সংগ্রহ করে ফুলের বুক থেকে। ফিরে আসে বাসায়। বাসা থেকে বের হওয়া আর মধু সংগ্রহ করে ফিরে আসা এই তার কাজ। আধ কেজি মধু যোগাড় করতে একটা মৌমাছির কম করে হলেও পঞ্চাশ হাজার মাইল পাড়ি দিতে হয়। দূর দূরান্তে ছুটে চলে মৌমাছিরা মধু জোগাড় করতে। অনেক দূরের পথ পাড়ি দেয় কিন্তু তারা পথ হারায় না। গতিপথ ও তারা ভুল করে না। এক আশ্চর্য ব্যবস্থাপনা কায়েম করেছেন আল্লাহ্ তায়ালা এদের ভেতর। ফুল খোঁজে মৌমাছি। পেয়েও যায় এক সময়। হয়তো তখন

সে বাসা থেকে অনেক দূরে। ওখানে থেকেই ইথারের মাধ্যমে, বাতাসের ঢেউয়ে ভেসে আসে তার খবর। চলে আসে বাসার মৌমাছিদের কাছে।

মৌমাছির মাথার ওপরে রয়েছে দু'টো সরু শুড়। ওটা কাজ করে অ্যান্টিনার মতো। ও দু'টোই খবর পাঠানোর কাজে সহায়তা করে। ফ্যাক্স, দূরালাপণ বা টেলেক্স। এসব বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার হিসেবে ধরা হয়। আর তা নিয়ে কৃতিত্বও ফলানো হয়। আসলে এতে কৃতিত্বের কিছুই নেই। এসব তো অনেক আগে থেকেই প্রচলিত রয়েছে প্রকৃতির বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার মাঝে। হাজার বছর আগে থেকে মৌমাছিরা এসব পদ্ধতি ব্যবহার করছে।

যাই হোক,

মৌমাছি তার শুঁড় দুটো (অ্যান্টেনা স্বরুপ) নাড়াতে থাকে। তারা একটু হয়তো গাইলো, একটু নাচলো। ওদিকে খবর পৌছে গেল বাসায়। সেখানে আবার আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে সংবাদ সংগ্রহের। তাতে কোনও বাধার সৃষ্টি হচ্ছে না। ঠিক ঠিক মতোই বাতাসে ভেসে আসছে খবর। অর্থাৎ মধু পাওয়া গেছে,তোমরা এসো।

এই খবরের ওপর নির্ভর করে রাণী মৌমাছির নির্দেশে সহযোগী মশারা উড়াল দিল বন্ধুর ঠিকানা অনুযায়ী। মাইলের পর মাইল পাড়ি দিয়ে ঠিকানা মতো ঠিক পৌছে যায় তারা। ওখানে জোগাড় করে মধু। ফেরার পথেও যাতে তারা পথ না হারায় সেজন্যে রয়েছে অভিনব ব্যবস্থাপনা।

বাসা থেকে পাঠানো হচ্ছে সংকেত। সময় মতো। 'ঠিক কতো মাইল দূরে আছো তুমি,' 'এখন পূবে না পশ্চিমে' 'এবার যাচ্ছো উত্তরে বা দক্ষিণে' 'বাসা তোমার এদিকে'। এমন সব দিক নির্দেশনার মাঝ দিয়ে বাসায় পৌছে যায় তারা।

সামান্য একটা ঠিকানা খুঁজে পেতে আমাদের লেগে যায় ঘন্টার পর ঘন্টা। ঠিকানা হারিয়ে ফেলি তো বার বার অন্যকে জিজ্ঞেস করতে হয়। 'ভাই, ওই ঠিকানাটা কোথায় বলতে পারেন?'

আমি লণ্ডনে বার বার গিয়েছি। বার বারই হারিয়ে ফেলি রাস্তা। একবার এদিক, একবার ওদিক। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে যাই। শেষমেশ অবশ্য পৌছে যাই।

কিন্তু মৌমাছিরা কোনও দিন তাদের যাত্রাপথ ভোলে না। হারিয়ে ফেলে না। সংগ্রহ হলো ফুলের রস। শেষ হলো ঘরে ফেরার পালা।

এবার চলবে পরীক্ষা নিরীক্ষা।

যেন দুর্গন্ধ বা রুগ্ন ফুল থেকে রস সংগ্রহে না আসে। কিছু মৌমাছি ঘরের চারদিকে পাহারা দেয়। এরা হচ্ছে অধ্যাপক বা বিশেষজ্ঞ। রস সংগৃহীত হবার আগে তারা পরীক্ষা করবে।

চিকিৎসক মৌমাছিরা দুষিত বা বিষাক্ত মধু সংগ্রহকারী মৌমাছি দেখেই টের পেয়ে যায়। তারা চমকে ওঠে। সাথে সাথেই ঝাঁপিয়ে পড়ে দুষিত মধু সংগ্রহকারীর ওপর। ডানা ছিঁড়ে ফেলে। তাকে মেরে নিচে ফেলে দেয়।

আপনারা খেয়াল করলে দেখতে পাবেন মৌচাকের নিচে পড়ে থাকে ডানা ছেঁড়া মৌমাছি।

এ জ্ঞান কে শেখালো ওদের?

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন!

আবার দেখুন, মশার মনে জাগিয়ে দিয়েছেন রক্ত খাবার তৃষ্ণা। তাদের জানিয়ে দিয়েছেন রক্ত তাদের খাদ্য। সেই রক্ত চুষে নেয়ার জন্য তিনি তাদেরকে দয়া করে একটি শুন্যগর্ত, তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম শুঁড় দিয়েছেন। মশা তার সেই সুতীক্ষ্ণ শুঁড় মানব দেহের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে রক্ত শুষে নেয়। এই ক্ষুদ্র প্রাণীটির ওপর আল্লাহ্ তা'লার আরও একটি অনুগ্রহ এই যে; তিনি এদের দু'টো হালকা পাতলা পাখা দিয়েছেন। আত্মরক্ষার জন্যে। মানুষ তাকে ধরার বা মারার চেষ্টা করা মাত্র সে টের পেয়ে যায়। পলকে পাখায় ভর দিয়ে উড়ে পালায়। ফের ঘুরে আসে একটা চক্কর দিয়েই। মশার যদি বুদ্ধি ও ভাষাজ্ঞান থাকতো তো এমন দয়ালু সৃষ্টিকর্তার করুণার জন্যে এতো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো যে তা দেখে মানুষ বিস্ময়ে

হতবাক হয়ে যেত। মশার ভাষা নেই তাই তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও প্রশংসার কথা আমরা বুঝতে পারি না।

এসম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন–

'অলাকিল্লা তাফ্কাহুনা তাসবিহাহুম।'

'কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ্ পাঠের ভাষা বুঝো না।'

আমার বন্ধু ও বুজুর্গ,

জীব জন্তু অসংখ্য। তাদের বিচিত্র সৃষ্টি এবং আশ্চর্যময় জীবন যাপনের শেষ নেই। সব জীব জানোয়ার তো দূরের কথা একটি প্রাণীর বা একটা আশ্চর্যময় ঘটনার যথাযথ জ্ঞান লাভ করা ও বর্ণনা করা অসম্ভব।

আপনি কি বলতে পারেন, এই অসংখ্য জীব-জানোয়ার, ইতর প্রাণী এমন বিচিত্র আকৃতি, মনোহর মূর্তি, সুডৌল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সুদৃশ্য গঠন কেমন করে অস্তিত্ব পেল? এরা কি নিজেরা এমন আশ্চর্য গঠনে সৃষ্টি করেছে; না, আমরা ওদের এমন সুকৌশলে সৃষ্টি করেছি? এই দু'টো জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজলেই মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের অসীম ক্ষমতার পরিচয় লাভ করতে পারি। কিন্তু মানুষ নিতান্তই উদাসীন ও অলস।

সুবহানাল্লাহ্! কী অপূর্ব তাঁর মহিমা!

কী অসীম তাঁর ক্ষমতা!

যেসব চোখ দৃষ্টি শক্তি থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তালার সৃষ্টি নৈপুণ্যের ওপর চোখ রাখেনা তিনি তো ইচ্ছে করলে তাদের অন্ধ করে দিতে পারেন। কিন্তু তিনি তা করেন না। তিনি শুধু এমন করেন যে তারা চোখ থেকেও দেখে না। সংসারে এমন অনেক লোক আছে যারা বাইরের চোখ দিয়ে দেখে বটে কিন্তু অন্তরের চোখের সাহায্যে গভীর দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে উপদেশ নেয় না। তারা শোনে কিন্তু বধির। শোনা থেকে শিক্ষা নেয় না। বরং জীব-জানোয়ারের মতো কেবল একটি শব্দ শোনে; অর্থাৎ বাক্যটির আওয়াজ শোনে মাত্র। তা থেকে নীতি উদ্ধার করে না। মাথা খাটিয়ে ঘটনা থেকে কোনও উপদেশ গ্রহণ করে না। এমন লোক সম্পর্কেই আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, 'অলাক্বাদ জারা'না লি জাহান্নামা কাসিরাম্ মিনাল জিন্নি অল ইন্‌স; লাহুম কুলুবুল লা' ইয়াফ্কাহুনা বিহা; অলাহুম লা ইয়ুব্সিরুনা বিহা; অলাহুম আজানুল্ লা ইয়াশ্ মাউনা বিহা; উলাইকা কাল আন্‌আমি বাল্‌হুম আদাললু; উলাইকা হুমুল গাফিলুন।'

'আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্যে অনেক জ্বিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে তারা বোঝেনা; তাদের চোখ রয়েছে, তারা দেখে না; আর তাদের কান রয়েছে তবু তারা শোনেনা। তারা চারপেয়ে পশুর মতো; বরং তার চেয়ে নিকৃষ্ট। এরাই হলো উদাসীন।'

গোটা সৃষ্টজগতের প্রতিটি সৃষ্ট পদার্থে, তার প্রতিটি কণায় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ক্ষমতার, দয়ার, মমতার আর মহিমার যে বিচ্ছুরণ ফুটে বেরুচ্ছে তা দেখার; যে নিদর্শন লেখা রয়েছে তা পড়ার আর যে গুণগান ও প্রশংসা কীর্তন চলছে তা শোনার সময়, অবকাশ ও অনুভব শক্তি আজ আর আমাদের নাই।

একটা পিপীলিকার ডিম অতি ক্ষুদ্র পদার্থ। ধূলিকণার মতো। একটু গভীর ভাবে তার দিকে চোখ ফেললে, একটু কান পেতে শুনলে আমরা শুনতে পাবো সে বলছে, ওহে উদাসীন মানব! কোনও চিত্রকর যদি দেয়ালে বা ক্যানভাসে একটা ছবি বা নকশা আঁকে তোমরা তার শিল্প নৈপুণ্য ও দক্ষতা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাও। পত্র-পত্রিকা, রেডিও-টেলিভিশনে আলোচনা করতে থাকো, শত মুখে তার প্রশংসা করতে থাকো। কিন্তু কই, আমার মহান দয়াল প্রভু পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা রাব্বুল আলামীনের কোনো সৃষ্টি দেখে তাঁর প্রশংসায় তো মত্ত হতে দেখি না।

এসো, আমার কাছে এসো। আমাকে দেখো।

আমার মাঝে তুমি সৃষ্টিকর্তার অপার মহিমা, চিত্র চাতুর্য আর শিল্প নৈপুণ্য দেখতে পাবে। দেখো, আমি একটা বালি কণার চেয়ে বড় নই। অনাদি, অনন্ত, মহা শক্তিমান শিল্পী তাঁর লীলা খেলা আমার মাঝ দিয়ে শুরু করবেন।

আমার থেকেই একটা পিপীলিকা সৃষ্টি করবেন। ভেবে দেখো, এতো ক্ষুদ্র আমাকে কত অংশে ভাগ করবেন। এক অংশ থেকে তৈরি করবেন হৃদপিন্ড।

অন্য অংশ থেকে সৃষ্টি হবে মাথা, হাত, পা ও অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

আবার দেখো, আমার ক্ষুদ্র মাথাটির মাঝে ও মস্তিষ্কের ভেতর বেশ ক'টা কামরা ও ভান্ডার ভাগ করবেন। মস্তিষ্কের একটা কামরায় স্বাদশক্তি, অন্যটাতে ঘ্রাণ। আরেকটিতে শোনার শক্তি। এভাবে এক একটা কামরায় আলাদা ক্ষমতা ও শক্তির সৃষ্টি করবেন।

আমার মস্তিষ্কের বাইরের দিকে কয়েকটা পেয়ালা সদৃশ গর্ত সৃষ্টি করে তাদের ওপর অভাবনীয়ভাবে নানা ধরনের নকশা এঁকে দেবেন। তার সাথে আবার এই মাথার মাঝেই নাক, মুখ গহ্বর তৈরি করে আহার গ্রহণের জন্যে গলনালী বা পথ তৈরি করবেন। আমার এই ক্ষুদ্র কলেবর থেকেই দেহের বাইরে হাত, পা, ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বের করবেন। আবার পেটের ভেতর এমন সব কামরা তৈরি করবেন যাদের একটাতে খাবার জমা হবে। আরেক কামরায় হজম হবে। আবার অন্য একটা পথ দিয়ে খাবারের অসার অংশটুকু বের হয়ে যাবে। পেটের ভেতর এসব কর্মকান্ডের জন্যে আলাদা আলাদা ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরি করবেন।

আমার দেহের ভেতরে ও বাইরে এতো ধরনের জিনিস সংযোজিত হবার পরও আমার গঠন খুব হালকা ও আমার গতি খুব দ্রুত। আরও ভালো করে দেখলে বোঝা যাবে যে, আমার দেহের অবয়বটিকে তিনভাগে তৈরি করে বিশেষ নিপুণতার সাথে এক খন্ডকে অন্য খন্ডের সাথে জুড়ে দেবেন। চৌকিদারের মতো আমার কোমরেও দাসত্বের পেট বেঁধে দেবেন। চৌকিদারের কালো পোষাকের মতো আমার গায়েও কালো উর্দি চড়িয়ে দেবেন।

তারপর হে মানুষ, আমার গঠন ও সৃষ্টি পূর্ণ হলে যে দুনিয়াকে তুমি শুধু তোমার নিজেরই সম্পত্তি মনে করছো সেখানে বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ পাক আমাকে প্রকাশ করবেন।

তুমি যে সব পদার্থকে কেবল মাত্র তোমারই ভোগের জন্যে বলে ধারণা করছো সে সব নেয়ামতের মাঝে তোমার মতো আমিও চলাফেরা ও ভোগ করতে থাকবো। তোমরা মনে করে থাকো, পৃথিবীর যাবতীয় জীবজন্তু ও সব ধরনের পদার্থ শুধু তোমাদেরই সেবার জন্যে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আমি দেখতে পাবো, আল্লাহ্ তায়ালা গোটা মানবজাতিকে আমার সেবক ও খাদেম নিযুক্ত করেছেন।

তোমরা দিন-রাত অক্লান্ত মেহনত করে ভূমি কর্ষণ, বীজ বপন, পানি সেঁচ করে জমিনকে উর্বর করো। গম, ধান ইত্যাদি শস্য, বিভিন্ন ধরনের তরি-তরকারি তৈরি করবে। শাক-সব্জি উৎপন্ন করবে। সেগুলোকে ঠিক সময় মতো কেটে, শুকিয়ে, ভেঙে তার শাঁস গ্রহণ করে যে কোন সুরক্ষিত জায়গায় লুকিয়ে রাখবে। এবার দয়াময় প্রতিপালক আমার মত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দাসকে জানিয়ে দেবে কোথায় রেখেছো তুমি ওগুলো। আমি মাটির নিচে আমার গর্তের মূল ঠিকানায় পৌঁছে যাবো। তারপর তোমার দীর্ঘ দিনের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা সঞ্চিত শস্য আমি সামান্য মেহনতে দখল করে নেবো। এক বছরেরও বেশি সময়ের খাবার নিয়ে কেটে পড়বো খুব কম সময়ে।

তুমি সঞ্চয় করলে তা নানাভাবে অনেক অপচয় হবার ভয় রয়েছে; কিন্তু আমি এমন সুরক্ষিত ও নিরাপদ জায়গায় সতর্কতার সাথে জমিয়ে রাখবো যে তার সামান্য শস্যও নষ্ট হবে না। আবার দেখো, আমাদের সংগৃহীত শস্য শুকোবার দরকার হলে খোলা মাঠে জমিনের ওপর ছড়িয়ে রেখে দেব। ওদিকে বৃষ্টি আসার আগেই তার আগমনী বার্তা দয়াময় প্রতিপালক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আমাদের জানিয়ে দেবেন। আমরা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে ওই শস্যকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাবো। সেখানে বৃষ্টির পানি পৌঁছুতে পারবে না। আমাদের সংরক্ষিত ফসলও নষ্ট হবে না।

কিন্তু হে মানুষ!

তোমরা এতই অজ্ঞ যে, যদি খোলা মাঠে শস্য স্তূপীকৃত করে রেখে দাও; ঠিক তখনি বৃষ্টি বা ঢলের পানি এসে পড়ে তবে তোমরা তা থেকে ফসলকে রক্ষা করতে পারো না। কারণ,

বৃষ্টি বা ঢলের আগমণ সংবাদ তোমরা আগেই জানতে পারো না। আচমকাই আসে পানি। শস্য নিয়ে যায় ভাসিয়ে। কিছুই করার থাকে না তোমাদের।

কাজেই আমি সেই মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের কৃতজ্ঞতা কেমন করে প্রকাশ করবো- যিনি আমাদের এমন সুখ স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তিনি, যিনি একটি তুচ্ছ বালু কণার মতো ডিম থেকে এমন সুন্দর, ক্ষিপ্র ও চতুর পিপীলিকা তৈরি করেছেন আর তোমাদের মতো এমন শ্রেষ্ঠ জীবকে এত জ্ঞান-গরিমা দেয়ার পরও আমাদের মতো সামান্য প্রাণীর সেবক করে দিয়েছেন, কেমন করে তাঁর শুকরিয়া আদায় করবো? কী ধরণের গুণগান তাঁর জন্যে গাইবো? তাঁর মহিমা কোন্ ভাষায় প্রকাশ করবো?

বন্ধু ও বুজুর্গ!

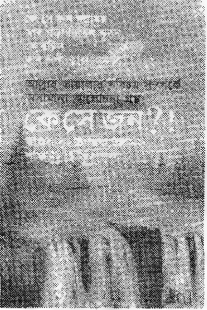
ছোট বড়, লম্বা বেঁটে প্রাণীদের মাঝে এমন কেউ নেই যে এভাবে আপন ভাষায় মহান সৃষ্টিকর্তার অপার মহিমা ও অসীম প্রতাপের প্রশংসা কীর্তন না করে। শুধু প্রাণীরা কেন? প্রত্যেক লতা-পাতা এমনকি জড় পদার্থগুলো বিশালাকার পর্বতমালা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা পর্যন্ত বিশ্বপ্রভুর তাসবীহ পাঠ করছে, প্রশংসা বর্ণনা করছে। কিন্তু অন্যমণস্ক ও মোহাচ্ছন্ন মানুষ তা শুনতে পায় না।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,' ইন্নাহুম আ'নিস্ সামঈ লা মা'জুলূন০'

'নিশ্চয়, তারা (সৃষ্ট পদার্থ সমূহের তাসবীহ) শোনা থেকে আনমনা বা অচেতন রয়েছে।'

আল্লাহ্ তালা আরও বলেন, 'অইম্ মিন শাইয়িন ইল্লা ইয়ুসাব্বিহু বিহামদিহি অলাকিল্লা তাফ্কাহুনা তাস্বিহাহুম।'

'যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু তাঁর (আল্লাহ্ তালার) প্রশংসা সহকারে তাস্বীহ পড়ছে। কিন্তু তোমরা (হে মানব!) তাদের তাস্বীহ বুঝতে পারছো না।'



ছয়

এবার দয়াময় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের অপার মহিমার প্রকাশ মহাসমুদ্রের কল্লোল ধারা সম্পর্কে আলোচনা করবো। একটা মহাসাগর সমগ্র ভূমন্ডলকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। সাগর, উপসাগর, খাড়ি, নদ-নদী এসব থেকে বের হওয়া শাখা প্রশাখা বা এদেরই আলাদা আলাদা অংশ। এই স্থলভাগ সেই মহাসাগরের মাঝে অবস্থিত ক'টি দ্বীপ ছাড়া আর কিছুই নয়। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে-'মহাসমুদ্রের মাঝখানে স্থলভাগের দৃষ্টান্ত ঠিক তেমন যেন জমিনের উপর মাঝে মধ্যে কতগুলো আস্তাবল।'

পৃথিবীর জল যেমন স্থলের চেয়ে আয়তনে বড় তেমনি জলভাগের সৃষ্টি-নৈপুণ্য, তার মাঝে বিচিত্র ব্যাপার আর বিস্ময়কর জিনিসগুলোও স্থলের চেয়ে বেশি। এর কারণ এই যে, যত ধরনের জীব-জানোয়ার ও অন্যান্য জিনিস মাটিতে আছে তাদের উপমা জলের ভেতর তো রয়েছেই, তাছাড়াও এমন কিছু বিশেষ ধরনের জীব-জানোয়ার সেখানে রয়েছে যে যার নযীর স্থলে নেই।

সেই জলজ জানোয়ার ও জিনিসগুলোর আকার ও প্রকৃতি আলাদা। কিছু জলজ প্রাণী এতো ক্ষুদ্র যে খালি চোখে দেখাই যায় না; আবার কিছু জানোয়ার এতো বিশাল যে, সামুদ্রিক জাহাজ তার পিঠে ঠেকলে আরোহীরা মনে করে চড়ায় ঠেকেছে। যাত্রীরা স্থল মনে করে তার ওপর নেমে পড়ে। চলা ফেরা করে, ছুটাছুটি করে। এমনকি রান্নার কাজ শুরু করে দেয়। ক'দিন চলে যায়। হঠাৎ একদিন নড়ে ওঠে দ্বীপ। বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতেই শুরু করে ছোটাছুটি। প্রাণ ভয়ে ভীত, আতঙ্কিত মানুষ। সাগরের জলে তোলপাড় তুলে অদৃশ্য হয় বিশাল জলজ প্রাণী। এসব নিয়ে রচনা হয়েছে অনেক বই-পত্র। তার বিবরণ এতো অল্প সময়ে দেয়া সম্ভব না।

ভেবে দেখুন তো, সুনিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ্ তায়ালা সাগরের অতল তলে এক প্রকার জীবন সৃষ্টি করেছেন। তাদের ওপরের খোলসকে ঝিনুক বলে। আল্লাহ্ তায়ালা তার মনে বৃষ্টি বর্ষণের সময় বোঝার জ্ঞান দিয়েছেন। বৃষ্টি বিন্দু পেটে ধারণ করে নেবার জন্যে তার মনের মাঝে সংবাদ দিয়ে দেন। বৃষ্টি শুরু হবে অনুভব করতে পারলেই ওরা সমুদ্রের লোনা পানির গভীর তলা থেকে সাগরের কিনারে এসে হাজির হয়। বৃষ্টির মিষ্টি পানি-বিন্দু পেটের ভেতর নেবার জন্যে উপরের দিকে মুখ খুলে পড়ে থাকে। কয়েক বিন্দু বৃষ্টির মিষ্টি পানি তার পেটে পড়লেই মুখ বন্ধ করে ফেলে। সেই বৃষ্টি বিন্দুকে শুক্রের মতো গর্ভে ধারণ করে মায়ের মতো সযত্নে রক্ষা করে। ঝিনুকের ভেতরের সেই বৃষ্টি বিন্দুকেই আল্লাহ্ তায়ালা অবশেষে মহামূল্যবান মুক্তায় পরিণত করেন।

অবশ্য ঝিনুকের পেটে বৃষ্টি বিন্দু মুক্তায় পরিণত হতে দীর্ঘ সময় নেয়। এগুলোর কোনটা ছোট, কোনটি বড়। সমুদ্রের অতল তলায় ডুবুরী নামিয়ে সেই মুক্তো আহরণ করা হয়। তা দিয়ে তৈরি নানা ধরনের অলংকার শরীরের শোভা বাড়ায়। তৈরি হয় সুখ শান্তির নানা উপকরণ।

মহান রাব্বুল আলামীন লাল রঙের পাথর দিয়ে সাগরের তলায় তৈরি করেন বৃক্ষ। আসলে এই গাছটি কোনও উদ্ভিদ নয় তবে তার আকৃতি ও প্রকৃতি বৃক্ষের মতোই। এই পাথুরে গাছটি আসলে 'মারজান' বা প্রবাল। ওই প্রবাল বৃক্ষ থেকে ছুঁড়ে দেয়া এক ধরনের ফেনাকে বলে 'আম্বর'। ঢেউয়ের মাথায় বয়ে এসে এই ফেনা জমা হয় তীরে।

সাগরের বুকে চলে জাহাজ ও নৌকা।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানুষকে দিয়েছেন বুদ্ধি। তারই জোরে সে শিখেছে জাহাজ ও নৌকা তৈরির কৌশল। মাল-আসবাব ও যাত্রী নিয়ে সে ভেসে থাকে পানির ওপর। কত সুন্দর। ওদিকে মাঝি-মাল্লাকে বুদ্ধি দিয়েছেন তার সাহায্যে অনুকূল ও প্রতিকূল বায়ু চিনে বিভিন্ন দিকে নৌকা চালিয়ে নিতে পারে।

তিনি তৈরি করেছেন তারা। আকাশের বুকে। নক্ষত্রের পরিচয় শিখিয়ে দিয়েছেন মানুষকে। মহা সমুদ্রের কূল নাই, কিনার নাই। চারদিকে শুধু পানি আর পানি। এমন সময় নাবিক দিক চিনে নেয় নক্ষত্র দেখে। সঠিক পথে চালিয়ে নেয় নৌকা। এটা সবচেয়ে বেশি বিস্ময়কর ব্যাপার।

এবার আসি পানির আকৃতি ও অবস্থার দিকে।

বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। পানি তরল ও স্বচ্ছ। অংশগুলি জোড়া, পরস্পর মিলিত পানির আরেক নাম জীবন। মানুষ যখন পিপাসার্ত হয়ে একটু পানির মুখাপেক্ষী হয়;ঠিক তখন যদি কোথাও পানি খুঁজে না পাওয়া যায় তো সে মুহূর্তে এক পাত্র পানির জন্যে যথা সর্বস্ব বিলিয়ে দিতেও আমরা দ্বিধা করি না।

আবার দেখুন যদি এক অঞ্জলি পরিমাণ পানি মূত্রাশয়ের ভেতর আটকে যায় তা বের করে ফেলার জন্যে হাতের সব ধন-দৌলত ব্যয় করে ফেলতে তৈরি হয়ে যাই। মোটকথা, পানি ও সমুদ্রের অবাক করা ও বিচিত্র ব্যাপারের সীমা নেই।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, 'ক্বোল আরাআয়তুম ইন্ আস্বাহা মাউকুম গাওরান ফাম ইয়াতিকুমু বিমা ইম্ মা'য়ীন০'

'বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছো কি, যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভের গভীরে চলে যায়, তখন কে তোমাদের সরবরাহ করবে পানির স্রোত ধারা?'

আল্লাহ্ তায়ালা আরও বলেন, 'অ-আয়াতুল্ লাহুম আন্না হামাল্না জুর্‌রিয়াতাহুম ফিল্ ফুল্কিল মাশ্হুন অ-খালাক্না লাহুম মিম্ মিসলিহি মায়ারকাবুন; অইন্ নাসা নুগ্‌রিকহুম ফালা শারিখা লাহুম অলাহুম ইয়ুনকাযুন; ইল্লা রাহমাতাম্ মিন্না অমাতা আন ইলা হীন০'

'তাদের জন্যে একটা নিদর্শন এই যে, আমি তাদের সন্তান-সন্ততি বোঝাই নৌকায় চড়িয়েছি। তাদের জন্যে নৌকার মতো বাহন সৃষ্টি করেছি, যাতে আরোহন করে। আমি ইচ্ছে করলে তাদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি, তখন তাদের জন্যে কোনও সাহায্যকারী নেই এবং তারা পরিত্রাণ ও পাবে না।'

বুজুর্গ ও বন্ধু-

বায়ূমন্ডল ও একটি ঢেউয়ের সমুদ্র বিশেষ। বাতাসের ঢেউগুলো সাগরের কল্লোল ধারার মতো বয়ে যাচ্ছে অবিরাম। বাতাস এমন সূক্ষ্ম পদার্থ যে, তাকে দেখতে পাওয়া যায় না। আবার এমন স্বচ্ছ যে, তার ভেতর দিয়ে অপর দিকের বস্তুকে দেখতে কোনও অসুবিধে নেই। সেই বায়ু সারাক্ষণ আমার প্রাণের উৎস। পানাহার আমাদের দেহের খোরাক। দেহ রক্ষার জন্যে দিনে একবার মাত্র পানাহার করলেও আমরা বেঁচে থাকতে পারি। কিন্তু যদি সামান্য সময়ের জন্যে আমরা বাতাস গ্রহণ করতে পারি বা প্রাণের খাদ্য বাতাস ভিতরে না ঢোকে তো আমরা বাঁচতে পারি না। মুহূর্তের জন্যেও আমরা তার চিন্তা করিনা।

বাতাসের আর একটা গুণ হচ্ছে এই যে, তার প্রভাবে সমুদ্রের জাহাজ ও নৌকাগুলো পানির ওপর ভেসে রয়েছে; ডুবতে পারে না।

আসমান তো অনেক বড় কথা বায়ূমন্ডলের কথা যদি আমরা চিন্তা করি। এই সূক্ষ্ম ও হালকা বায়ুস্তরের মাঝে বাতাসের সাহায্যে মহান শিল্পী আল্লাহ্ তায়ালা কত বিচিত্র পদার্থ সৃষ্টি করেছেন। মেঘ, বৃষ্টি, বজ্রনিনাদ, বিদ্যুৎ, শিলা, তুষার,-এসব এই বাতাসের মাঝ থেকে তৈরি হয়।

জলভরা মেঘমালাকে দেখুন-

হালকা, সূক্ষ্ম বাতাসের মধ্যেই তা হঠাৎ তৈরি হয়ে যায়। সাগর, নদ-নদী থেকে জলীয় বাষ্প শুষে নিয়ে বাতাস তাকে উপরের দিকে পাঠিয়ে দিলেই তা মেঘের আকারে পরিণত হয়।

তাছাড়া রোদের তেজের জন্যে পাহাড়-পর্বত থেকে বাষ্প উপরের দিকে উঠে যায়; ফের বাতাসের জলীয় উপাদান থেকেও বাষ্পের জন্ম হয়। এসব বাষ্প উপরে উঠে মেঘরাশি সৃষ্টি হয়। আর যে সব দেশ বা জমিন পাহাড় পর্বত বা সাগর থেকে অনেক দূরে, বাতাস মেঘরাশিকে সেদিকে নিয়ে যায়। মেঘ থেকে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি ওই জমিনে পড়তে থাকে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো সোজাসুজি জমিনের ওপর পড়ে। বৃষ্টির যে ফোঁটা জমিনের যেখানে পড়া মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিধানে লিপিবদ্ধ রয়েছে; ঠিক সেই ফোঁটা সেখানেই পড়ে।

যে পোকা বা কীট পিপাসায় কাতর হয়েছে তার তৃষ্ণা মেটানোর জন্যে বৃষ্টি বিন্দু ঠিক তার উপরই পড়ে। সে নিবারণ করে পিপাসা। এভাবে যে উদ্ভিদ পানির অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছিল সে নির্ধারিত বৃষ্টি-বিন্দুর ছোঁয়া পেয়ে সতেজ হয়ে ওঠে। যে শস্য-বীজ পানির মুখাপেক্ষী, তার জন্যে যে বৃষ্টি-বিন্দু নির্দিষ্ট ছিল ঠিক সেই বিন্দুটিই তার ওপর পড়ে। পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে সে। গাছের যে শাখায় রসের অভাবে ফলটি শুকিয়ে যাচ্ছে তার জন্যে নির্ধারিত হয়েছে ক'ফোটা। ঠিক সময়ে গাছের গোড়ায় তা পড়ে যায়। মাটি শুষে নেয় তা। গাছের নিচে শিকড়, তার থেকে শিরাগুলো যা চুলের চেয়ে চিকন, ওই বৃষ্টির পানি শুষে নিয়ে প্রায় শুকনো ফলটি পর্যন্ত পৌছে দেয়। সরস ও তাজা হয়ে ওঠে ফলটি।

হায় মানুষ!

আমরা শুধু বুভুক্ষের মতো সেই ফল খেয়ে নিই। সুস্বাদু ফলের রসে আমাদের মুখ ভরে ওঠে। আমরা আনন্দিত, তৃপ্ত হই। কিন্তু মহান রাব্বুল আলামীন কিভাবে তা আমাদের কাছে পৌছে দিলেন সে নিয়ে কখনও মাথা ঘামাই না।

প্রতিটি বৃষ্টি বিন্দুর ওপর লেখা আছে যে, এটা অমুক জায়গায় পড়ে অমুক ব্যক্তির বা বান্দার রিযিক তৈরি করবে। দুনিয়ার সমস্ত মানুষ ও সৃষ্ট জীব একসাথে মিলে যদি বৃষ্টি ফোঁটার সংখ্যা গুণতে চায়, পারবে না। অসম্ভব। বৃষ্টির পানি যদি ফোঁটায় ফোঁটায় না পড়ে একবারেই সব পানি পড়ে যেত সেক্ষেত্রে উদ্ভিদ গুলো নিজেদের দরকার মতো ধীরে সুস্থে, অল্প অল্প করে পানি পেতে পারতো না। এতে সেগুলোর বিশেষ ক্ষতি হয়ে যেত। কারণ, উদ্ভিদ তিলে তিলে বাড়ে। সেজন্যে তাদের পানিও আস্তে আস্তে প্রয়োজন হয়। এভাবে সারা বছর ধরে অবিরাম বৃষ্টি হলে উদ্ভিদ জাতির বিশেষ ক্ষতি হতো। সেজন্যেই মহাজ্ঞানী কৌশলময় সৃষ্টিকর্তা বর্ষার মাঝখানে তৈরি করেছেন শীত, গ্রীষ্ম, হেমন্ত, বসন্ত ঋতু।

শীতের প্রকোপে বায়ুমন্ডলের মাঝের জলীয় কণাগুলো ধূণো তুলোর মতো বরফ হয়ে গুঁড়ি গুঁড়ি পড়তে থাকে। ওদিকে পার্বত্য অঞ্চলকে বরফের ঘর তৈরি করেছেন। বাতাস সেই বরফ গুঁড়োকে নিয়ে পার্বত্য এলাকায় মিলিত হয়। পাহাড়ের গা আচ্ছন্ন হয়ে যায় বরফে। পার্বত্য এলাকার বাতাস যেহেতু শীতল। বরফ সেখানে জমে কঠিন আকার ধারণ করে। বসন্ত এলে শীতের প্রকোপ কমে বাতাসে উত্তাপ বাড়তে থাকে। তখন ধীরে ধীরে বরফ গলে যায়। সেখান থেকে দরকার মতো বরফ গলা পানি নদী-নালা বয়ে সমতল এলাকার দিকে নেমে আসে। গ্রীষ্মে সূর্যের তেজে বাতাস আরো গরম হয়; বরফ আরো বেশি গলে। নদী-নালার পানি বাড়তে থাকে। মানুষ দরকার মতো পানি ক্ষেত খামারে ব্যবহার করতে পারে।

সারাক্ষণ বৃষ্টি হলে জীব-জানোয়ার এবং উদ্ভিদ সবারই বিশেষ কষ্ট হতো। এমন কি অস্তিত্ব শেষ হয়ে যেতো। আবার বৃষ্টির সময় পানি একবারে বর্ষিত হয়ে বছরের বাকী অংশটুকু অনাবৃষ্টি থাকলে উদ্ভিদ শুকনো হয়ে যেত।

কাজেই দেখুন; বরফ সৃষ্টি করার মাঝে আল্লাহ্‌তায়ালা এই কৌশল ও দয়া লুকিয়ে রেখেছেন। আল্লাহ্‌তায়ালার দয়া ও করুণা শুধু বরফ সৃষ্টির মাঝেই সীমাবদ্ধ নেই। সৃষ্ট জগতের প্রতিটি জিনিসের মধ্যে তার দয়া বিরাজ করছে। বরং জমিন ও আসমানের সব অংশগুলোকে আল্লাহ্‌তায়ালা সত্য, ন্যায় ও বিচক্ষণতার সাথে সৃষ্টি করেছেন। এই ব্যাপারেই আল্লাহ্‌তায়াল বলেন-

'অমা খালাক্‌নাস্ সামাওয়াতি অল আরদা অমা বায়নাহুমা লা' ঈবিন০ মা খালাক্‌নাহুমা ইল্লা বিল্ হাক্কি অলা কিন্না আক্‌সারুহুম লা ইয়ালামুন০ 'আসমান ও জমিনকে আর তার মাঝের যাবতীয় জিনিসকে আমি খেল-তামাশা হিসেবে সৃষ্টি করি নাই। আমি এই দুই কে সত্য সহকারে ঠিক ঠিক মতো সৃষ্টি করেছি। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই তা বোঝে না।'

বুজুর্গও বন্ধু-

আসমান রাজ্যে যেসব বিচিত্র ব্যাপার ঘটছে সে তুলনায় জমিনের বৈচিত্র খুবই সামান্য।

আল্লাহতালা বলেন,'অজ্জাআল্‌নাস্ সামাআ শাক্‌ফাম্ মাহ্‌ফুজাঁও অহুম আন্ আয়াতিহা মু'রিদুন০'

'এবং আসমানকে আমি সুরক্ষিত ছাদ করেছি; অথচ তারা তাঁর নিদর্শন গুলো থেকে বিমুখ রয়েছে।'

আরেক জায়গায় তিনি বলেন,'লা খালকুমুস সামাওয়াতি অল আরদি আকবারু মিন খালকিন্ নাসি অলাকিন্না আক্‌সারান্নাসি লা ইয়ালামুন০'

'অবশ্যই আসমান ও জমিনের সৃষ্টি মানুষ জাতিকে পয়দা করার চেয়ে বেশি বিরাট কাজ কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা বোঝে না।'

আসমান রাজ্যে যেসব বিচিত্র ব্যাপার ঘটছে সে তুলনায় জমিনের বৈচিত্র খুবই সামান্য।

আল্লাহতালা বলেন, 'অজাআল্নাস্ সামাআ শাক্ফাম মাহ্ফুজাঁও অহুম আন্ আয়ানিতহা মু'রিজুন।'

'এবং আসমানকে আমি সুরক্ষিত ছাদ করেছি; অথচ তারা তাঁর নিদর্শনগুলো থেকে বিমুখ রয়েছে।'

আরেক জায়গায় তিনি বলেন, 'লা খাল্কুস সামাওয়াতি অল আরদি আকবারু মিন খালকিন্ নাসি অলাকিন্না আকসারান্নাসি লা ইয়ালামুন।'

'অবশ্যই আসমান ও জমিনের সৃষ্টি মানুষ জাতিকে সৃষ্টি করার চেয়ে বেশি বিরাট কাজ, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা বোঝে না।'



সাত

আল্লাহতায়ালা আকাশ রাজ্যকে সাজিয়েছেন তারার বীথি দিয়ে।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। অসংখ্য তারা দিয়ে তৈরি আকাশ। কোটি কোটি তারা। শুধু মিল্কিওয়েতেই রয়েছে দশ হাজার কোটি তারা। সংখ্যায় অনেক কিন্তু চেহারায়, আকারে তাদের কোনও মিল নেই। কোনটি লাল, কেউ সাদা। আবার কোনটা পারদের মতো, কেউ ছোট, কোনটা বড়।

রাত্রির আকাশের দিকে দেখুন, একদল তারা এক হয়ে আকার ধারণ করেছে মূর্তির। কোনও গুচ্ছের আকার বকরির মতো, কোনটার বলদের, কোনটার বৃশ্চিকের মতো। ভালো মতো দেখলে আরও অনেক ধরনের আকৃতি খুঁজে পাওয়া যায়।

জানা যায় যে দুনিয়াতে যত ধরনের পদার্থ রয়েছে তার হুবহু মূর্তি তারার গুচ্ছ দিয়ে আকাশে এঁকেছেন মহান রাব্বুল আলামিন।

এবার আসুন তারাদের নানা ধরনের গতিবিধি আর ঘোরা-ফেরার ব্যাপারটিতে। কোন তারা গোটা আকাশ রাজ্যে একমাসে একবার ঘুরে আসে। কিছু এক বছরে, কিছু বারো বছরে আবার কিছু ত্রিশ বছরে সারা আকাশ ভূবন প্রদক্ষিণ করে।

অন্যদিকে এমন কিছু তারা আছে যারা এতো ধীর আর আস্তে চলে যে মনে হয় চিরকাল একই জায়গায় স্থির অবস্থায় রয়েছে। যদি আকাশ চিরস্থায়ী হতো আর মহাপ্রলয় বা ক্বিয়ামত না ঘটতো তাহলে ছত্রিশ হাজার বছরে ওই তারাগুলো হয়তো আকাশ পথ পাড়ি দিত।

আবার দেখুন, পৃথিবীর আকার কতো বড়ো। কোনও লোকের তার শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়। ওদিকে এই দুনিয়ার চেয়ে সূর্য প্রায় এক'শ ষাট গুণ বড়। এতে আমরা সহজেই আন্দাজ করতে পারি যে, সূর্য কতটুকু দূরে এই দুনিয়ার থেকে যে তাকে একটা থালার মতো ছোট দেখা যায়।

সূর্যের দেহ এতো বড় কিন্তু তার গতি কতো ক্ষিপ্র! তার দেহচক্রটি চক্রবাল ঘুরে আসতে আধঘন্টা সময় লাগে মাত্র। কিন্তু এতটুকু সময়ের মাঝে আসমানের পথে দুনিয়ার মোট দূরত্বের এক'শ ষাট ভাগ পথ পাড়ি দেয়।

সেজন্যেই একদিন জনাব রাসুল মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিব্রাইল আমিনকে জিজ্ঞেস করলেন,'সূর্য কি ডুবে গেল?'

'লা-নাআম' অর্থাৎ 'না-হাঁ'।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, 'এ আবার কেমন কথা? জিব্রাইল আমিন বললেন, 'না-হাঁ" বলতে যতক্ষণ সময় লেগেছে ততটুকু সময়ের মধ্যে সূর্য পাঁচ'শ বছরের পথ পাড়ি দিয়েছে।'

আকাশে এমন তারাও রয়েছে যা পৃথিবীর চেয়ে হাজার গুণ বড়। অথচ তাদের অনেককে চোখে দেখা যায় না। সুবিশাল আকাশ জুড়ে রয়েছে হাজার, লক্ষ, কোটি তারা। এক একটা তারা, গ্রহ-উপগ্রহের মাঝে আলাদা কৌশল, গঠনপ্রণালী ও রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। প্রত্যেকের স্থিতি, গতি, প্রত্যাবর্তন, উদয়, অস্ত আর মধ্য আকাশে অবস্থান-সবকিছুর মাঝে রয়েছে গভীর কৌশল আর আলাদা জ্ঞান।

অন্যসব গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থিতির রহস্য ঠিকমতো বোঝা না গেলেও সূর্যের গতিবিধি, তার রহস্য বেশ প্রকাশ্য ও স্পষ্ট। মহাকৌশলময় আল্লাহ তা'আলা তার গতিপথকে কক্ষপথ ঘেঁষা আকাশের সাথে আকৃষ্ট করে সৃষ্টি করেছেন। সেজন্যে কোনও ঋতুতে সূর্য আমাদের মাথার ওপর মধ্য আকাশ দিয়ে চলে যায়। অন্য ঋতুতে এদিকে ওদিকে কিছু হেলে যায়। আবার তাতে কোনও সময় অতিরিক্ত ঠান্ডা আবার কখনো ভীষণ গরম পড়ে। একসময় শীত গরমের ভারসাম্য থাকে।

সূর্যের গতিপথের পরিবর্তনের কারণেই শীত, গরম ঋতুর পরিবর্তন হয়। সেজন্যেই এক এক ঋতুতে দিন-রাত ছোট বড় হয়।

এই সূর্য সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'সূর্যকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চতুর্থ আকাশে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আল্লাহতায়ালা রাব্বুল আলামিন সৃষ্টির শুরুতে "জওহর" নামে একটা পদার্থকে চোখের সামনে আনলেন। "জওহর" মহামূল্যবান পাথর বা মূলপদার্থ। তিনি ওই পদার্থের ওপর তাঁর অনন্ত ক্ষমতা ও প্রতাপের দৃষ্টি ফেললেন।

'জওহর' কাঁপতে শুরু করলো। ফাটল ধরলো তার গায়ে।

'জওহর' ভাঙতে শুরু করলো।

ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেতে লাগলো। তারপর হঠাৎ সে পানি ছিটালো। গলে যেতে লাগলো নিরেট পাথর। পানির ফোয়ারা উঠলো।

পানি কেঁপে উঠলো আল্লাহর ভয়ে।

সে পালাতে চায় দূরে কোথায়।

আল্লাহর দৃষ্টির প্রভা তার সহ্য হয় না। তার বিভায় সে দিশেহারা হয়ে পড়ে।

পালানোর ইচ্ছা জাগতেই তার শরীরে ঢেউ জাগে। ছোট ছোট। বুদবুদের মতো। তারপর একসময় বড় হয় ঢেউগুলো। মাঝারি। আরো বড় হয়। আরো বড়। বিশাল পাহাড়ের আকার নিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সে আল্লাহ তায়ালার প্রবল প্রতাপান্বিত দৃষ্টির সামনে থেকে পালানোর জন্যে ছুটতে থাকে দিগ্বিদিক।

দুনিয়ার এক দিক থেকে আরেক দিকে ছুটে যায় ঢেউমালা।

এবার আল্লাহতায়ালা তাঁর অনন্ত অনুগ্রহ ও দয়ার দৃষ্টি ফেললেন ছুটতে থাকা পানি রাশির ওপর। তাতে সমস্ত পানির অর্ধেক জমাট বেঁধে যায়। এই জমাট অংশ সাতটি স্তরে ভাগ হয়ে যায়। প্রথম স্তরটি আরশ। তার দিকে দৃষ্টি ফেলতেই উপর দিকে উঠতে থাকে। সুপ্রতিষ্ঠিত হয় সপ্ত আকাশের ওপর। তখনও ভয়ে কাঁপছে আরশ। দয়ালু আল্লাহতায়ালা তাতে লিখে দিলেন 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্।' স্থির হলো আরশ্ মহল্লা। এরপর সুপ্রতিষ্ঠিত হলো সাত আসমান। প্রতিষ্ঠিত হলো সপ্ত জমিন।

অবশিষ্ট পানির অংশটুকু এখনও কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে ছুটছে। দিগ্বিদিক। দিশাহারা। আটলান্টিক মহাসাগরের উর্মিমালা ছুটে চলেছে। আল্লার ভয়ে ভীত হয়ে। প্রশান্ত মহাসমুদ্রের শান্ত ঢেউগুলো এখনও কাঁপছে। পরাক্রান্ত প্রভু আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ভয়ে। ভূমধ্য

সাগর, আরব সাগর, ভারত সাগর, মৃত সাগর, লোহিত সাগর, নীল নদ, দজলা, ফোরাত, নায়াগ্রা, আমাজান, গঙ্গা, কপোতাক্ষ, করতোয়া, মহানন্দা, পূণর্ভবা, পদ্মা ও মেঘনার পানি আজও ছুটে চলেছে একদিক থেকে আরেক দিক। আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে। ক্বিয়ামাত পর্যন্ত এমনই থাকবে।

আল্লাহতায়ালা বলেন..

'অ-কানা আরশুহু আলাল মাঈ-'

'আর আরশ ছিল পানির উপর.'

তারপর সেই পানিতে ওঠে প্রচন্ড উর্মি। স্রোতের ঘূর্ণি সংঘাতে আর উচ্ছাসে তৈরি হয় বাষ্প। তা ধীরে ধীরে ভাঁজ ভাঁজ হয়ে উঠে যায় ওপরের দিকে। আসলে তাতে ছিল ফেনার উপকরণ। তা দিয়েই আল্লাহতায়ালা উপরের দিকে তৈরি করেছেন আকাশগুলো। আর নিচের দিকে পৃথিবী।

পয়লা সাত আসমান ও সাত জমিন ছিল একসাথে। পরস্পর সংলগ্ন ও অবিচ্ছিন্ন। আল্লাহতায়ালা তার মধ্যে সৃষ্টি করলেন চোদ্দটি স্তর। প্রতিটি স্তরকে আবার আলাদা অবস্থান দিলেন।

আল্লাহতায়ালা বলেন....

'সুম্মাস তাওয়া ইলাস্ সামায়ি অহিয়া দুখান।'

'তারপর তিনি দৃষ্টি দিলেন আকাশের দিকে। যা ছিল জমাট ধোঁয়া বা ধূম্রকুঞ্জ।'

তত্ত্বজ্ঞানীরা বলছেন, 'আল্লাহতায়ালা আকাশগুলোকে তৈরি করেছেন ধোঁয়া দিয়ে। বাষ্প দিয়ে নয়। কারণ ধোঁয়া শান্ত। আর এর এক ভাগ অন্য অংশকে উঁচু করে রাখে। অন্য দিকে বাষ্প সারাক্ষণ বিশৃঙ্খল ও অগোছালো। আসলে এসব মহান আল্লাহতায়ালার অনন্ত মহিমা আর অসীম প্রজ্ঞার অকাট্য দলিল।

কথিত আছে সবচেয়ে নিচু আকাশ, পৃথিবীর কাছের আসমানের আসল রঙ হচ্ছে সাদা। কিন্তু "ক্বাফ" পর্বতের নীল রঙ ছায়া ফেলে আকাশে। তখন আকাশের রঙ হয় নীল।

আল্লাহতায়ালা বলেন, 'অহুয়াল আজীজুল গাফুরুল্লাজি খালাকা সাব'আ সামাওয়াতিন তিবাকা।'

'দয়ালু ও প্রবল পরাক্রমশালি আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আকাশ রাজ্যকে সাতটি স্তরে।'

'মা তারা ফি খালকির্ রাহ্মানি মিন তাফাউতি।'

'আপনি কি দেখেছেন কোনও ভুল করুণাময়ের এই সৃষ্টিতে!?'

'ফারজিঈল বাসারা; হাল তারা মিন ফুতুর।'

'আবার দেখুন তো; কি? দেখতে পাচ্ছেন কি কোন বিশৃঙ্খলা?'

'সুম্মার জিঈল বাসারা; কার্রাতাইনি ইয়ান্ কালিব্ ইলাইকাল্ বাসারু খাশিয়াঁও অহুয়া হাশির।'

'এবার আবার দেখুন, বার বার দেখুন। আপনার দৃষ্টি এমন বিস্ময়কর সৃষ্টি দেখে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে। ভয়ে আর সম্ভ্রমে। অবনত হয়ে।'

আল্লাহতায়ালা আকাশ রাজ্যকে তৈরি করেছেন সাতটি স্তরে।

'অ বানায়না ফাওকাকুম শাবআন্ শিদাদা।'

'তিনি সাত স্তরে সুসজ্জিত করেছেন আকাশকে।'

এতবড় আকাশ! কিন্তু কোনও খুঁত নেই!

গোটা দুনিয়াকে ঘিরে রয়েছে প্রথম আকাশ। বাংলাদেশের মাথার উপর নীল আকাশ। সুদূর কেপটাউন-কালো মানুষের দেশ। তার মাথার উপর নীল আকাশ। দুরন্ত পশ্চিমাদের দেশ টেক্সাস। সারি সারি মাথা তুলে থাকা পাথুরে পাহাড়ের ওপর নীল আকাশ।

অন্ধকারের দেশ আফ্রিকা, গহীন বন, নিচে কাফ্রী জংলী রাসটারিয়ান, হারারি জাতির বসবাস। তাদের পর্ণ কুটিরের উপর, দূরে, নীলাকাশ। পবিত্র ভূমি মক্কা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মভূমি। বায়তুল্লাহর মাথার উপর রৌদ্রকরোজ্জল নীলাকাশ। শেষ

নবী, শ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দেহ মুবারাক যে মাটির নিচে, সোনার মদিনা, তার মাথার উপর ঝলমলে নীল আকাশ।

বিশালদেহী, হলুদ রঙের ককেশিয়ান রাশিয়াবাসীর দেশ, ইমাম বোখারী (রঃ) এর দেশ তাসখন্দ, মস্কো, কাজাখস্থান, উজবেকস্থান, খিরগিজস্থান-তার মাথার উপর ঘন নীল আকাশ।

বরফ ঢাকা সাইবেরিয়া, আইসল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড এর মাথার উপর বিবর্ণ নীলাকাশ। নিউইয়র্ক সিটি, শিকাগো সিটি, টেনেসি, ম্যানহাটান, ওয়াশিংটন, বোস্টন, লস অ্যাঞ্জেলস, লাস ভেগাস, বিভারলি হিলস, কানাডা, মন্ট্রিল, টরেন্টো, সিডনী, সিসিলী, রোম, ইটালী, গ্রীস, স্পেন, অসলো, নরওয়ের মাথার উপর ঘন নীল আকাশ।

আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তুঙ্গ উর্মিমালা; তার মাথার ওপর নীলাকাশ। প্রশান্ত মহাসাগরের শান্ত ঢেউমালা; তার মাথার ওপর নীলাকাশ।

আলপ্স পর্বতমালার মাথার ওপর নীলাকাশ।

সিনাই পবর্তমালার মাথার ওপর নীলাকাশ।

আন্ডেজ পর্বতমালার মাথার ওপর নীলাকাশ।

হিমালয় পর্বতমালার মাথার ওপর নীলাকাশ।

উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু, সুমেরু থেকে কুমেরু পর্যন্ত বিস্তৃত, দিগন্ত জোড়া নীলাকাশ।

কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলা নেই। নিখুঁত, নিশ্চিদ্র।

কোথাও কোনও খুঁতি লাগেনি। স্থির, অচঞ্চল।

রাত্রির আকাশ। তারা ঝলমল। সন্ধ্যাতারা। সপ্তর্ষি। বৃশ্চিক।

আল্লাহতায়ালা বলেন, 'তু লিজুল লাইলা ফিন্ নাহারি, অতুলিজুল নাহারা ফিল্ লাইল।'

'আমি প্রবেশ করাই রাত্রিকে দিনের ভিতর, দিনকে রাত্রির ভিতর।'

'অ-আয়াতুল লাহুমুল লাইলু নাশ্লাখু মিনহুন নাহারা ফাইজা হুম্ মুজ্‌লিমুন।'

'তাদের জন্যে এটা একটা উপমা যে আমি দিনের পেছনে রাত্রিকে চালাই রাত্রির পিছনে দিন।'

তো রাত্রির আকাশ দিনকে ঢেকে নেয়।

অসংখ্য তারা ঝিলমিল রাতের আকাশ। চন্দ্রালোকিত রাত। পূর্ণিমার। আবার অমাবস্যার রাত। চাঁদ যখন খেজুর গাছের শাখার আকার ধারণ করে। আবার বড় হতে হতে তা পায় পূর্ণ থালার আকার। গোটা দুনিয়া ভেসে যায় রূপালী চাঁদের আলোয়। জলাশয় গুলোর পানি যেন রূপালী তরল। মানুষের মনে লাগে রঙ।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, 'অল্ কামারা ক্বাদ্দারনাহু মানাজিলা হাত্তা আদা কাল উরজুনিল ক্বাদিম।'

'আমি চাঁদকে সৃষ্টি করেছি। তা কখনও খেজুর গাছের শাখার মতো হয়ে যায়; কখনও পূর্ণতা পেয়ে থালার আকার ধারণ করে।'

রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনের আকাশকে দেখি।

সূর্যোদয়ের সময়ের আকাশকে দেখি। কী মহান, অন্তর স্তব্ধ করা আকার নিয়ে পূর্ব দিগন্তে ওঠে। লাল। গাঢ় লাল রং ছড়িয়ে দেয়। ভয় ধরিয়ে দেয় অন্তরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সম্পর্কে। তাঁর সৃষ্টির প্রতাপ দেখে মহাপ্রভুর ক্ষমতা আঁচ করা যায়। ধীরে ধীরে সে ওপর দিকে উঠে আসে। আলো ছড়ায়। দুনিয়ার মানুষ কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে। আলো ঝলমল করে ওঠে শহর, বন্দর, গ্রাম, বাজার, হাট।

এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে উত্তাপ ছড়াতে, আলো দিতে দিতে। ঢলে পড়ে, পশ্চিম দিকে। দিগন্তের শেষ সীমায়। মিশে যেতে থাকে নিসর্গ রেখায়। কমলা রঙের আবীর ছড়াতে ছড়াতে।

আল্লাহতায়ালা বলেন, 'অশ্ শামসু তাজ্‌রি লিমুশ্‌তাকারিল্লাহা জালিকা তাক্বাদিরুল আজিজুল আলীম।'

'আমি সূর্য উদয় করি পূর্ব দিকে, অস্ত দেয় পশ্চিম দিকে। এর মধ্যে রয়েছে মহাজ্ঞানী আল্লাহতালার বিরাট নিদর্শন।'

এভাবে দিন শেষে আসে রাত্রি। রাত্রি শেষে আসে দিন। আবহমান কাল ধরে প্রকৃতির এই বিচিত্র লীলা চলে।

আল্লাহতায়ালা বলেন, 'লাশ্ শামসু ইয়াম্ বাগি লাহা আন্ তুদরিকাল্ কামারা অলা লায়লু শাবিকুন্নাহার অকুল্লুন ফি ফালাকিই ইয়াশ্‌বাহুন।'

'সূর্য কখনও চন্দ্রকে করেনা অতিক্রম, চন্দ্র কখনও সূর্যকে। রাত্রি কখনও দিন ছাড়িয়ে যায় না; দিন কখনও রাত্রিকে। এরা প্রত্যেকে চলেছে নিয়মের বাঁধনে, পাড়ি দিয়ে চলেছে আপন আপন কক্ষপথ।'

মেঘাচ্ছন্ন আকাশকে দেখি। ঘনঘোর আঁধারে ঘেরা নীলাকাশ। যেন কালো শ্লেটের রঙ পেয়েছে। মাঝে মাঝে গর্জে উঠছে বজ্রবিদ্যুৎ। দিনের বেলায় নেমে এসেছে যেন রাত্রির কালো আঁধার। আকাশ চেরা বিদ্যুৎ স্তব্ধ করে দেয় হৃদয়। মেঘের সংঘাতে বেজে ওঠে কানফাটানো গর্জন। কড় কড় কড়াৎ!

কী বিচিত্র লীলা! মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কী অপূর্ব সৃষ্টি নৈপুর্ণ্য!

মহাবিশ্ব, মহাকাশ, গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে যুগে যুগে নানান ভুল, অদ্ভুত তত্ত্ব, তথ্য ও বিশ্বাস চালু ছিল। ওসব প্রচলিত ভুল তত্ত্ব ও তথ্য থেকে কোরআন আশ্চর্যজনকভাবে মুক্ত। অ্যারিস্টোটাল, পিথাগোরাস, প্লিনী, টলেমি এসব প্রাচীন লেখকদের বইয়ে লেখা, বেশিটুকুই আজকের বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু কুরআনের বলাটুকু অভ্রান্ত, অকাট্য,চূড়ান্তভাবে নির্ভুল। ফরাসী শল্যচিকিৎসক ডঃ মরিস বুকাইলি তাঁর 'বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান' বইয়ে বলেন-

Where as monumental erorrs are to be found in the Bible. I could not find a single error in the Quran. I had to stop and ask myself, 'If a man was the author of the Quran, how could he have written facts in the seventh century A.D. that today are shown to be in keeping with modern scientific knowledge. What human explanation can there before this observation? In my opinion, there is no explanation. There is no special reason why an inhaitant of the Arabian Peninsula should have had scientific knoledge on certain subjects that was ten centuries ahead of the period.

বিশ্বসৃষ্টির মৌলিক তত্ত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

'আওলাম ইয়ারাল্লাজিনা কাফারু আন্নাস্ সামাওয়াতি অল্ আরদা কানাতা রাতকান ফাফাতাক্নাহুমা অজাআল্না মিনাল্ মাঈ কুল্লা শাইয়িন হাইয়িন আফালা ইয়ুমিনুন।'

'অবিশ্বাসীরা কি দেখতে পায় না যে, আদিতে আকাশ মন্ডল ও পৃথিবী সবই এক সাথে জুড়ে ছিল। তারপর আমি তাদেরকে আলাদা করে ফেললাম। আর পানি থেকে জীবজগত সৃষ্টি করলাম।'

অন্য জায়গায় আল্লাহতায়ালা বলেন-

'সুম্মাস্ তাওয়া ইলাস সামায়ি অহিআ দুখান।'

'তারপর আমি আকাশের দিকে লক্ষ্য করলাম। ওটা তখন ধোঁয়া আর ধোঁয়া ছিল।'

এখানে দুটো ব্যাপার গুরুত্বপুর্ণ।

শুরুতে আকাশ ধোঁয়া রূপে ছিল। আর একসাথে ছিল।

মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে বিজ্ঞান বলছে সৌরজগতটির ব্যাস সাতশ কোটি মাইল। আমরা যে ছায়াপথের অধিবাসী, তার নাম হলো 'Local Galaxy.' এর এক দিক থেকে আরেক দিক কয়েক লাখ আলোকবর্ষ। এটা হলো সবচেয়ে ছোট ছায়াপথ। অন্যগুলো আঙুর গুচ্ছের মতো থোকায় থোকায় অবস্থান করছে। আদিতে মহাশূন্য জুড়ে একটা ধীর ঘূরন্ত সুবিশাল গ্যাসীয় মেঘ (primary Nebula) ছিল। অবিরত আর প্রচন্ড গতিতে তার ঘোরার কারণে আরো কতগুলো ঘুরন্ত টুকরোর সৃষ্টি হলো। সেগুলোতে মহাকর্ষ বল, বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় বল ইত্যাদির উপস্থিতির কারণে এদের তাপ, চাপ, ঘূর্ণন বেড়েই চললো। তাতে দেখা দিল তাপ-পারমানবিক (Thermonuclear) বিক্রিয়া। এই প্রচন্ড তাপ ও চাপ থেকে তৈরি হলো হাইড্রোজেন, হিলিয়াম। তার থেকে এলো কার্বণ অক্সিজেন। আরো পরে তৈরি হলো লোহা, তামা ইত্যাদির পরমাণু।

এই টুকরো 'নেবুলা' গুলো নিজের ভেতরেই নানান বেগে বিভিন্ন দিকে ঘোরার ফলে জন্ম নিল নক্ষত্র ও গ্রহ।

কাজেই দেখা যাচ্ছে পবিত্র কোরআন সঠিক কথা বলেছে। একসাথে ছিল, ধোঁয়ার আকারে ছিল। 'সামাওয়াত' বা Extraterrestrial world' একত্রিত ছিল। বর্তমান বিশ্বে 'মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব' একটা সর্বজন স্বীকৃত মতবাদ। আদি সৃষ্টির সময়, ক্ষণ, প্রক্রিয়া, পরিবেশ সম্পর্কে এই তত্ত্ব সফল ব্যাখ্যা দিতে পেরেছে। এই ব্যাখ্যার সাথে পবিত্র কালাম পাকের উচ্চারণের মিল দেখা যাচ্ছে।

আল্লাহ্‌তায়ালা সুরা আম্বিয়া'র তিরিশ আয়াতে বলছেন, 'মিথ্যাবাদীরা কি দেখছে না যে, আকাশজগত আর পৃথিবী পরস্পর এক হয়ে ছিলো। যা খুব ঘন আর মিশ্রিত গোলক।' এই আয়াতে 'কানাতা রাত্কান ফাফাতাক্নাহুমা' এই শব্দ তিনটির মানে বুঝলেই মহাবিস্ফোরণ ও আদি অগ্নিগোলক সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা সময়ের হিসেব করে বলছেন আজ থেকে পনের 'শ কোটি বছর আগের কথা। তখন সবদিকে শুধু অনন্ত-অসীম শূন্যতা। শূন্যতা আর শূন্যতা। কোথাও কিছুই নেই। এ সময়টাকে বিজ্ঞানীরা বলছেন 'শূন্য-সময়'। ঠিক তখনি খুবই সূক্ষ্ম একটা বিন্দুতে আচমকা আদি বস্তু ও শক্তির সীমাহীন সমাবেশ ঘটে। তাতে সৃষ্টি হয় অকল্পনীয় চাপ ও তাপের। ফলে ঘটে যায় মহা প্রলয়ঙ্করী বিস্ফোরণ। অস্তিত্ব পায় 'প্রিমর ডিয়াল ফায়ার বল' বা আদি অগ্নিগোলক।

কিন্তু এমন বিরাজমান অসীম শূন্যতার মাঝে বস্তু, শক্তি, সময় এলো কোথে কে?

বিজ্ঞানীরা সবিনয়ে জানাচ্ছেন, 'আমরা তা জানি না।'

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, 'আমি জানি। আমিই সৃষ্টি করেছি আকাশ মন্ডল। নিজ শক্তিতে। আর আমিই করেছি একে প্রসারিত।' (৫১ঃ৪৭)

'অস্‌সামাআ বানায়নাহা বিআইদিন অইন্না লা মু'শিউন।'

বিজ্ঞানীরা বলছেন সৃষ্টির শুরুতে চারদিকে শুধু আলো আর আলো দেখা যাচ্ছিল। আল্লাহ তায়ালাও তাই বলছেন,'আল্লাহু নুরুস্ সামাওয়াতি অল আরদি; মাসালু নুরিহি, কামিশকাতিন ফিহা মিসবাহুন; আল মিসবাহু ফি জুজাজাতিন। আজ্ জুজাজাতু কাআন্নাহা কাওকাবুন দুররিই ইয়ুন ইয়ুকাদু মিন শাজারাতিম্ মুবারাকাতিন জায়তুনাতিল লা শার কিয়াতিন অলা গারবিয়াতিন ইয়াকাদু জায়তুহা ইয়ুদিউ অলাও লাম তামশাশ্‌হু নারুন; নুরুন আ'লা নুরিহি। ইয়াহ্‌দি আল্লাহু লিনুরিহি মাই ইয়াশাউ।'

'আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী জ্যোতি। সেই জ্যোতির উপমা যেন একটি প্রদীপাধার। যাতে আছে একটা প্রদীপ। প্রদীপটি একটি কাঁচের পাত্রে শোভা পাচ্ছে। কাঁচপাত্রটি উজ্জল তারা মতো। তাতে পবিত্র জয়তুনের তেল প্রজ্জ্বলিত। যা না পুবমুখী, না পশ্চিম। আগুন না ছুঁলেও তার তেল যেন জ্বলে উঠবে এখনি। জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তাঁর সেই আলো দিকে।'

পজিট্রন-ইলেকট্রনের একজোড়া কণা সৃষ্টির জন্যে দশ দশমিক দুই লক্ষ বৈদ্যুতিক ভোল্ট শক্তির প্রয়োজন হয়। তাহলে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির জন্যে কত অকল্পনীয় শক্তির প্রয়োজন

হয়েছিল। অচিন্তনীয়। মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন তাঁর অপরিসীম শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন কালামে পাকে। 'তিনিই অনস্তিত্বের মাঝে অস্তিত্ব দান করেছেন।'

সৃষ্টির সূচনা প্রক্রিয়া ঠিক কালামে পাকে যেভাবে বর্ণনা করেছেন বিজ্ঞানীরাও বলছেন একই কথা। এখানে প্রশ্ন আসে স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে কেন তারা বলতে পারলো না। কারণ পবিত্র কোরাণে বজ্র নির্ঘোষে সে কথারই ঘোষণা দিচ্ছেন। 'তিনি আদি, তিনিই অন্ত। তিনি প্রকাশিত, তিনিই গুপ্ত।' (৫৭ঃ৩)

অন্য জায়গায় বলেন, 'তিনি দৃষ্টির মাঝে নন। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁরই দখলে। তিনি সূক্ষ্মদর্শী,সম্যক জ্ঞানী।'

আদি অগ্নিগোলক বা প্রিমরডিয়াল ফায়ার বলটি অস্তিত্ব লাভের সাথে সাথে ক্রমাগত ফুলতে থাকে। সম্প্রসারিত হতে থাকে। চারদিকে ছড়িয়ে যায়। এক সময় গোলকটিতে এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত বিশাল ফাটলের সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানীরা যাকে 'মহাজাগতিক তার 'বা 'কসমিক স্ট্রিঙ' বলেন।

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, 'সবচেয়ে আগে আল্লাহ পাক আমার নূর সৃষ্টি করেন। আমি আল্লাহর নূর থেকে আর বিশ্বজগত আমার নূর থেকে।'

বিজ্ঞানীদের মতে 'কসমিক স্ট্রিঙ' ই সৃষ্টি জাত বস্তুগুলোর মধ্যে প্রথম অস্তিত্ব লাভ করে। এ বিস্ময়কর বস্তুটি অস্তিত্ব প্রাপ্ত না হলে মহাবিশ্বের পক্ষে আজকের এই আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সংগঠিত হওয়া সম্ভব ছিল না। 'কসমিক স্ট্রিঙ' অত্যন্ত গতিসম্পন্ন, আলোর গতিতে চলাচল করে। কসমিক স্ট্রিঙ আসলে অদৃশ্য আর তার ধর্ম হচ্ছে আলোর তরঙ্গ।

কাজেই নূরে মুহাম্মাদীর যথেষ্ট মিল দেখা যাচ্ছে 'কসমিক স্ট্রিঙের' বৈশিষ্টের সাথে।

বিশ্ববিখ্যাত মনীষী মরিস বুকাইলী তাঁর জগদ্বিখ্যাত 'বাইবেল, কোরআন ও বিজ্ঞান' গ্রন্থে লেখেন, 'যখন আমি প্রথম দিকে কুরআনের ওহী ও তার অবতীর্ণ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করছি তখন পর্যন্ত আমি পুরোপুরি হালকা ভাবে নিয়েছিলাম। প্রায় উদ্দেশ্যহীন ছিলাম। আমি শুধু এটুকু জানতে চাচ্ছিলাম যে কোরানের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের কতটুকু মিল আছে। কোরানের বেশ কটা অনুবাদ পড়ে আমার মোটামুটি ধারণা হলো যে কোরান বিজ্ঞানের প্রতিটি অলৌকিক বিষয়ের দিকেই ইশারা করছে।

'তারপর অত্যন্ত গভীর দৃষ্টিতে সরাসরি আরবী ভাষায় কুরআনের ওপর গবেষণা চালালাম আর তার একটা সূচীপত্র তৈরি করে নিলাম। তখন সে সত্যের সাক্ষ্য দিতে হলো যা আমার সামনে ধরা পড়েছিল। পবিত্র কুরআনের একটা বর্ণনাও এমন নেই যার কোনও একটা অংশের ওপর সন্দেহ নজরে পড়ে। এর মৌলিকত্বকে যাচাই করেছি সারাক্ষণ ইঞ্জিলের সাথে। পুরোনো গ্রন্থ ও ইঞ্জিলে এমন অনেক বর্ণনা আমার সামনে পড়ে গেল যা আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বস্বীকৃত অনেক সত্যের সাথে পুরোপুরি অমিল রয়েছে।

'এতে সন্দেহ নেই যে,বর্তমানে যদি বিভিন্ন রকমের ইঞ্জিল নিয়ে গবেষণা করা হয় তাহলে খৃষ্টবাদ চরমভাবে মার খাবে।'

কোরানের আয়াত গুলোর সত্যতা বিজ্ঞান আবার প্রমাণ করছে।

রাতের বেলা নীলাকাশে যে কোটি কোটি তারা, গ্রহ এসব দেখি ওগুলো আমাদের ছায়াপথের মধ্যে। এই ছায়াপথ (Local Galaxy) পৃথিবী থেকে প্রায় বাইশ লক্ষ মাইল দূরে। বিশাল বিপুল এক অসীম জগত। এগুলোকে Island universe বলেছেন বিজ্ঞানী ইউইন হাবেল। ধারণা করা হচ্ছে মহাবিশ্বে প্রায় একশো কোটি গ্যালাক্সি বা দ্বীপ জগত রয়েছে। গোটা মহাবিশ্বে এই দ্বীপ জগতগুলো আবার গুচ্ছ আকারে (clustered) আছে। আবার কয়েকটা গুচ্ছ থেকে কয়েক হাজার উপগ্রহ গ্যালাক্সি (Satelite Galaxies) নিয়ে স্থানীয় গ্যালাক্সি দল তৈরি করে। প্রতিটি ছায়াপথ একে অন্যের চেয়ে প্রায় এক মেগা (১০১২) পারসেক দূরত্ব অবস্থান করছে। তার মানে প্রায় তেত্রিশ লাখ আলোক বর্ষ। বিজ্ঞানীদের মতে গুচ্ছ গ্যালাক্সির মধ্যে সবচেয়ে বড় দলের গ্যালাক্সি গুচ্ছ হচ্ছে Hercules cluster. তার সংসারে রয়েছে দশ হাজার ছায়াপথ ও উপ-ছায়াপথ। এটা আমাদের দুনিয়া থেকে তিন'শ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে।

পবিত্র কালামে পাকে আল্লাহতালা বলেন, 'আকাশে আমি গ্রহ-নক্ষত্র তৈরি করেছি। তা তোমাদের দেখার জন্যে করেছি সুশোভিত।'

বুরুজকে গ্যালাক্সি বলেই ধারণা করছেন তত্ত্বজ্ঞানীরা।

বুরুজ হলো গড়ে কমপক্ষে দশ হাজার কোটি সূর্যের আবাস। যাদের কেন্দ্রের (Galatic Centre) উজ্জ্বলতা কোটি সূর্যের সমান। দুর্বোধ্য পিচ্চি ছায়াপথ কোয়াসা OQ-172-এর উজ্জ্বলতা সূর্যের দীপ্তির চেয়ে দশ টিলিয়ন গুণ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কালামে পাকে বলেন, 'তিনি মঙ্গলময় সত্তা, যিনি আসমানে নক্ষত্রের জন্যে কক্ষসমূহ তৈরি করেছেন। এতে রয়েছে প্রদীপ সূর্য।

আরেক জায়গায় বলেন, 'আমরা আকাশে সৃষ্টি করেছি সুরক্ষিত দুর্গ সদৃশ বুরুজ সমূহ। এগুলো সজ্জিত করেছি তাদের জন্যে যারা প্রকৃত দর্শক। আল্লাহর প্রকৃত দর্শক হলো যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে স্মরণ করে আল্লাহকে। আর মহাবিশ্ব, পৃথিবী গুলোর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে। তারপর বলে, হে আমার মহান প্রতিপালক, তুমি শুধুই এসব কিছু সৃষ্টি করোনি। তুমিই পবিত্র। (৩ঃ১১৯)।

একটা গ্যালাক্সির আয়তন প্রায় সত্তর হাজার থেকে এক লক্ষ আলোকবর্ষ। ঘণত্ব বা পুরু প্রায় তিরিশ হাজার আলোক বর্ষ।

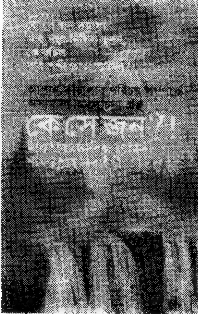
এক আলোকবর্ষ=ছয় লক্ষ কোটি মাইল।

এক পারসেক-৩.২৬ আলোকবর্ষ।

মহাবিশ্ব জগতের আয়তন জানা অসম্ভব। কারণ প্রতি মূহূর্তে এটা প্রসারিত হচ্ছে। ধারণা করা হয় এটা পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি আলোক বর্ষের চেয়েও অনেক বেশি।

সৌরজগত এগারটি গ্রহ, বত্রিশটি উপগ্রহ, অগণিত উল্কাপিন্ড, গ্রহাণুপুঞ্জ নিয়ে তৈরি। সূর্য এর প্রধান। সৌরজগতের সব বস্তুর শতকরা ৯৯.৯ ভাগ নিয়ে এটা গঠিত। সূর্য প্রতি মুহূর্তে ৬.৩* ১০১২ আর্গ শক্তি বিকিরণ করে। সূর্যের ভেতর সব সময় সংযোজন (Fusion) ও বিয়োজন (Fission) প্রক্রিয়া ঘটছে। যেমন ঘটে থাকে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের সময়। ছায়াপথকে কেন্দ্র করে সূর্যের প্রতি মুহূর্তে ২৫০ কিঃ মিঃ বেগে পরিক্রমণ করতে সময় লাগে প্রায় পঁচিশ বছর। সূর্যের কক্ষজাত সঞ্চালন তাকে ক্রমাগতই একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অর্থাৎ সোলার অ্যাপেক্সের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

কুরআন ও বিজ্ঞানের এইসব অপূর্ব তথ্য ও তত্ত্ব আমাদেরকে মহান রাব্বুল আলামিনের শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব ও প্রকৃত পরিচয় দান করে।



আট

এই অনন্ত রহস্যময় দিনরাত্রির আকাশ আল্লাহতায়ালা তৈরি করেছেন জমাট ধোঁয়া দিয়ে। প্রথম আকাশের নাম 'রক্বীয়া'। এই আকাশকে পুরু করা হয়েছে। পাঁচশত বছরের পুরু। পাঁচশত বছর বলতে বিজ্ঞানীদের ভাষায় ধরে নিতে পারি নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল। আর আমাদের নবী, সত্য রাসুল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায়

পাঁচশত বছরের অর্থ হচ্ছেঃ একটা আরবী দ্রুতগামী ঘোড়া। তার ওপর একজন দক্ষ ঘোড়সাওয়ার। অশ্বারোহী যদি ক্রমাগত একদিন সেই ঘোড়া ছোটাতে থাকে; কোথাও থামে না, বিশ্রাম নেয় না– যতদূর পর্যন্ত যাবে ততটুকু হচ্ছে একদিনের রাস্তা। এভাবে দু'দিন পর্যন্ত দৌড়ালে যতদূর যাবে সেটি হচ্ছে দু'দিনের রাস্তা। এক সপ্তাহ পর্যন্ত ক্রমাগত ছুটলে যতদূর যাবে তা হচ্ছে এক সপ্তাহের রাস্তা। একবছর পর্যন্ত দৌড়ালে হবে এক বছরের রাস্তা। একশত বছর পর্যন্ত দৌড়ালে হবে একশো বছরের রাস্তা। পাঁচশত বছর ধরে অবিরাম, অবিশ্রাম ছুটতে থাকলে যেখানে পৌঁছবে তা হচ্ছে পাঁচশো বছরের পথ।

তো জমিন থেকে প্রথম আকাশের দূরত্ব পাঁচশো বছরের পথ।

আল্লাহতায়ালা প্রথম আকাশ 'রক্বীয়া'কে পুরু করেছেন পাঁচশো বছরের রাস্তা। তার পর পাঁচশো বছরের পথ জুড়ে মহাশুন্য। কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই। এবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দ্বিতীয় আকাশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। এই আকাশটি লোহা দিয়ে তৈরি। নাম ফায়দুম বা মাউন। বিজলির মতো সারাক্ষণ চমকাচ্ছে এই আকাশ। পাঁচশো বছর পথের সমান পুরু করা হয়েছে এ আকাশটিকে। তার বিস্তারকে বড় করা হয়েছে। এত বড় করা হয়েছে যে প্রথম আকাশটি তার সামনে ক্ষুদ্র হয়ে গেছে। এতো ছোট হয়েছে যে মনে হয় বিশাল এক মাঠে ছোট্ট একটা মটর দানা পড়ে রয়েছে। বিশাল মাঠে একটা মটর দানা যেমন খুঁজে পাওয়া যায় না তেমন কোটি কোটি তারা রাজির, চন্দ্র সূর্যের এই বিশাল আকাশকে দ্বিতীয় আকাশের সামনে খুঁজেও পাওয়া যাচ্ছে না।

দ্বিতীয় আকাশের ওপর পাঁচশো বছর পথের পরিমাণ ফাঁকা। মহাশূন্যতা। কোনও কিছু নেই। তারপর তৃতীয় আকাশ। এই আকাশ তামা দিয়ে তৈরি। জ্যোতির্ময়। আলোক উজ্জ্বল তামা। আকাশের নাম মালাকুত বা হারিয়ুন। পাঁচশো বছর পথের পরিমাণ পুরু। মোটা। তার বিস্তার বা সীমানা কে আল্লাহ তায়ালা বড় করেছেন। এতো বড় করেছেন যে দ্বিতীয় আকাশ, যার সামনে প্রথম আকাশ একটা মটর দানার মতো; সেই বিশাল আকাশ তৃতীয় আকাশের সামনে এতো ছোটো হয়ে গেছে যে মনে হয় বিশাল মাঠের মতো তৃতীয় আকাশের সামনে দ্বিতীয় আকাশটি যেন একটা ছোট্ট মুরগীর ডিমের ছিলার মতো পড়ে আছে।

আবার ফাঁকা। পাঁচশো বছরের পথ। মহাশূন্য।

তার ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে চতুর্থ আকাশ। রূপা দিয়ে তৈরি। চোখ ঝলসে যায় এমন সে রূপা। কোনও মানুষ তার দিকে দৃষ্টি ফেলতে পারে না। অন্ধ হয়ে যায়। রূপালী আকাশ পাঁচশো বছর পথের মতো পুরু। নাম 'জাহেরাহ' তার বিস্তার বা সীমানা আল্লাহতায়ালা বড় করে দিয়েছেন।

এতো বড় করেছেন যে প্রথম আকাশটির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। দ্বিতীয় আকাশ ও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। চতুর্থ আকাশের বিস্তারের সামনে যেন বিশাল এক মাঠের ভিতর একটা পিয়াজের খসানো ছিলার মতো পড়ে রয়েছে তৃতীয় আকাশ।

এখন আবার মহাশূন্যতা। ফাঁকা। পাঁচশো বছরের রাস্তা। ধূ ধূ ফাঁকা জায়গা।

তার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পঞ্চম আকাশ। এই আকাশও পাঁচশো বছরের মোটা বা পুরু। আকাশটি সোনা দিয়ে তৈরি। সোনালী রঙের সোনা নয়। রক্তলাল। সোনা। অসহ্য তার রূপ। নাম দেয়া হয়েছে মুযাইয়্যিনাহ বা মুসাইয়্যিরাহ্। পাঁচশো বছরের পুরু পঞ্চম আকাশের বিস্তার বা সীমানাকে আল্লাহতায়ালা বড় করেছেন।

এতো বড় করেছেন যে পঞ্চম আকাশের বিশালতার সামনে যেন বিশাল এক ময়দানে মেয়েলোকের মাথা থেকে খসে পড়া একটা চুলের মতো পড়ে রয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ আকাশ।

আবার ফাঁকা। পাঁচশো বছরের পথ। কিচ্ছু নেই।

তার ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে ষষ্ঠ আকাশ। পাঁচশো বছরের পুরু।

তার চৌহদ্দীকে বড় করে দিয়েছেন। পাঁচশো বছরের পুরু ষষ্ঠ আকাশ এতো বড় হয়েছে যে পাঁচটি ক্রমশঃ বিশাল আকাশ তার সীমানার সামনে যেন বিশাল এক ময়দানে একটা মরা

মাছের চোখের মতো পড়ে রয়েছে। এই আকাশ মহামূল্যবান নীলা রত্ন দিয়ে তৈরি। তীব্র তার কিরণ। নাম 'খালেসাহ'।

আবার ফাঁকা। পাঁচশো বছরের রাস্তা। ধূ ধূ।

তার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সপ্তম আকাশ। মহামূল্যবান লাল রঙের ইয়াকুত পাথর দিয়ে তৈরি। নাম লামিয়াহ বা দামিয়াহ। নুরের জ্যোতিতে অতি উজ্জ্বল এ আসমান।

লামিয়াহ্ আকাশ পাঁচশো বছরের পুরু। এই আকাশের সীমানাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বড় করে দিয়েছেন। এতো বড় করেছেন যে ছয়টি আকাশ তার বিশালতার সামনে যেন বিশাল এক ময়দানে একটা হারিয়ে যাওয়া আঙটি!

সপ্তম আকাশে রয়েছে বায়তুল মামুর।

বায়তুল মামুর মহামূল্যবান আক্বীক পাথরের তৈরি। তার চারদিকে দেয়াল। একদিক ইয়াকুত রত্নের, অন্যদিক সবুজ পান্নার। তৃতীয় দিক দুধসাদা রূপোর। চতুর্থ দিক লাল সোনার।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, সপ্তম আকাশে রয়েছে শনি, ষষ্ঠ আকশে রয়েছে বৃহস্পতি, পঞ্চম আকাশে মঙ্গল, চতুর্থ আকাশে সূর্য, তৃতীয় আকাশে আছে শুক্র; দ্বিতীয় আকাশে বুধ, প্রথম আকাশে চন্দ্র।

মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিচিত্র সৃষ্টি লীলা। যার সৌন্দর্য, বৈচিত্র্যতা, গাম্ভীর্য আর বিশালতা রুদ্ধবাক করে দেয়। স্তব্ধ হয়ে যায় হৃদয়।

যিনি এতো বিচিত্র, সৌন্দর্যময়, বিশাল সৃষ্টির স্রষ্টা, তিনি কে?

কে সে জন?

কে সে জন যার গড়া নিখিল ভুবন;

কে রচিল রবি শশী তারা অগণন?!

তিনি আমাদের খালিক, মালিক। পরম প্রভু। সর্বশক্তিমান। আল্লাহ।

আল্লাহু আকবার। তিনি সবচেয়ে বড়। তাঁর চেয়ে বড় আর কেউ নাই।

আল্লাহতায়ালা যখন জমিনকে প্রতিষ্ঠিত করলেন তখন সে কাঁপছিলো থির থির করে। তাকে স্থির করার জন্যে আল্লাহ পাহাড়কে পুঁতে দিলেন। পেরেক হিসেবে।

'অল্ জিবালা আওতাদা।'

'আমি পাহাড়কে প্রোথিত করেছি পেরেক স্বরূপ।'

এই পাহাড় দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল ফিরিশতারা।

তারা বলল, 'হে আল্লাহ, আপনি এর চেয়ে শক্তিমান, গরুগম্ভীর, মহান ও ক্ষমতাধর কিছু কি পয়দা করেছেন?'

'হ্যাঁ, করেছি।' উত্তর দিলেন আল্লাহতায়ালা।

'কি সেটা?'

'লোহা।'

'লোহা কি কারণে এই পাথুরে পাহাড়ের চেয়ে শক্তিশালী?'

'লোহা দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করা যায় পাথুরে পাহাড়কে।'

'সুবহানাল্লাহ। তো এই লোহার চেয়ে শক্তিমান, ক্ষমতাধর কোনও কিছু কি তুমি তৈরি করেছ, দয়ালু আল্লাহ?'

'হ্যাঁ, করেছি।'

'কি সেটা?'

'আগুন।'

'আগুন দিয়ে লোহার কি ক্ষতি করা যায়?'

'আগুন লোহাকে উত্তপ্ত করে পানির মতো তরল করে দেয়। রহিত হয়ে যায় তার ক্ষমতা?

'হে আল্লাহ, আগুনের চেয়ে শক্তিশালী, ক্ষমতাময় কিছু কি আপনি সৃষ্টি করেছেন?

'হ্যাঁ, করেছি।'

'কি সেটা?'

'পানি।'
'পানি দিয়ে কী অসাধ্য সাধন করা যায়?'
'পানি দিয়ে আগুনকে নিভিয়ে ফেলা যায়।'
'হে আল্লাহ, পানির চেয়ে শক্তিমান কিছু কি পয়দা করেছেন আপনি?'
'করেছি।'
'তা কি?'
'বাতাস।'
'বাতাস কি করতে পারে?'
'বাতাস পানিকে তার স্থান থেকে সরিয়ে দিতে পারে।'
'বাতাসের চেয়ে শক্তিশালী?'
'আকাশ।'
'আকাশের কী ক্ষমতা।'
'সে সবার উপরে। বাতাস তাকে ছুঁতে পারে না। আকাশে প্রবেশ করতে পারে না কোনও জ্বিন। আনতে পারে না কোনও গোপন আসমানী সংবাদ।'
'অলাক্বাদ যাইয়্যান্নাস্ সামাআদ্ দুনিয়া বিমাসাবিহা অজাআল্নাহা রুজুমাল লিশ্ শায়াতীন। অ-আতাদনা লাহুম আজাবাস্ শায়ীর।'
'হে আল্লাহ্, আকাশের চেয়ে শক্তিশালী, পরাক্রান্ত কেউ আছে কি?'
'আছে।'
'কে?'
'তোমরা।'
'আমরা?!'
'হ্যাঁ, তোমরা। ফিরিশতারা।'
'আমাদের কি গুণাগুন?'
'তোমরা আমার অনুগত। অনুগ্রহ প্রাপ্ত। সম্মানিত। শক্তিধর। মহাবিক্রমশালী। তোমাদের সর্দার ফিরিশতা জিব্রাইল আমিন যদি একটা চিৎকার দেয় জগতের সমস্ত প্রাণ হৃদয় ফেটে মারা যাবে। তার পাখার একটা কোণার আঘাতে পাহাড়গুলো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। তোমাদের পায়ের যদি চাপ পড়ে, বিশ্বব্রহ্মান্ড ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তোমাদের নূর প্রকাশিত হলে জগতের সব অন্ধকার দূর হয়ে যায়। আমি তোমাদেরকে আদেশ করি, তোমরা সাথে সাথে মেনে নাও। কোনও অন্যথা করো না। তোমরা কোনও গুনাহ করো না। নিষ্পাপ। শুধু আমার হুকুম তামিল করো। তোমাদের মাঝে কিছুকে আমি আদেশ করেছি সিজদায় পড়ে থাকতে। তারা ক্বিয়ামাত পর্যন্ত সিজদায় পড়ে থাকবে। কিছুকে বলেছি রুকুতে থাকতে। তারা তাই থাকবে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত। কিছুকে হুকুম করেছি ক্বিয়ামত পর্যন্ত কওমায় থাকো। তা তারা থাকবে। আবার কিছুকে আদেশ দিয়েছি জলসায় থাকো। তারা প্রলয় দিবস পর্যন্ত তাই থাকবে। সেজন্যে তোমরা সবচেয়ে শক্তিধর।
ফিরিশতারা কৃতজ্ঞ চিত্তে বললো, 'তবে কি আল্লাহতায়ালা আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ শক্তিমান ও সম্মানিত আর কেউ নেই?
বজ্রনির্ঘোষে আল্লাতায়ালা বলেন, 'হ্যাঁ, আছে।'
'কে সে?'
'মানুষ।'
'মানুষ?!'
'হ্যাঁ।'
'কি তাদের মাহাত্ম্য, কি তাদের গুরুত্ব? কেন তারা এতো বড়?'
'তারা আমার খলিফা। দুনিয়াতে আমার প্রতিনিধি।'
'হে আল্লাহ, তারা গোনাহ করবে।'

'ক্ষমাও চাইবে। তখন তাদের গোনাহ মাফ হবে। তারা কাঁদবে। তখন তাদের পাপ পূণ্যে পরিণত হবে।'
'তাদের সাথে তোমার সম্পর্ক?'
'মনিব ও ক্রীতদাসের। প্রভু ও বান্দার।'
'কীসে তারা বড়?'
'তারা আমার সবচেয়ে আপন, আমার প্রেম!'
'কেন, আমরাই তো তোমার অনুগত। একজন ও বিদ্রোহী নাই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই দ্রোহী।'
'তবু তারা বড়।'
'কেন?'
'তাদের অন্তরে জ্বলছে এক হিরন্ময় বিশ্বাস।'
'কী সেই বিশ্বাস?'
'আমি কে? কি আমার ক্ষমতা। তারা বিশ্বাস করে-'লা'-নাই, 'ইলাহা'-কোনও উপাস্য 'ইল্লাল্লাহ্'-এক আল্লাহ ছাড়া। সেই আল্লাহ্ সবকিছু ছাড়া সব কিছু করতে পারেন। কিন্তু তাঁকে ছাড়া তাঁর সৃষ্ট জিনিস কিছুই করতে পারেনা।'
'শুধু বিশ্বাসের জন্যে তারা এতো বড়!'
'হ্যাঁ, শুধু এই বিশ্বাসের জন্যে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বুকের ভেতর হৃদয়ের গভীরে এই বিশ্বাসের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলবে ততক্ষণ তারা সবার চেয়ে সেরা।'
'আমাদের চেয়েও?'
'হ্যাঁ।'
'কেন?'
'তোমরা আমাকে দেখো। আমার অস্তিত্ব কাছে থেকে দেখে বিশ্বাস করো। কিন্তু মানুষ শুধু অনুভব করে আমাকে বিশ্বাস করে। আমার ভয়ে গোনাহ থেকে বাঁচে, আমাকে খুশি করতে পূণ্য করে।'
'হে আল্লাহ, কি তাদের সম্মান?'
'তারা যখন আমার সম্পর্কে জানার জন্যে কোনও রাস্তা ধরে তখন তোমাদের মতো নূরানী ফিরিশতাদের নূরের পর তাদের পায়ের নিচে বিছিয়ে দিই।'
'সুবহানাল্লাহ! তারা এতো বড়!'
'হ্যাঁ, তারা পাহাড়ের চেয়ে, লোহার চেয়ে, আগুনের চেয়ে, পানির চেয়ে, বাতাসের চেয়ে, আকাশের চেয়ে এমনকি তোমাদের চেয়ে বড়!'
"তিনি কে?" শুধু এই প্রশ্নের উত্তর যিনি জানেন তিনি এতো বড় সম্মান ও ক্ষমতার অধিকারী।
'কে তিনি?'
তাঁর পরিচয় তিনি নিজেই কালামে পাকে দিয়েছেন।
তিনি-
'আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইউম, লা-তা খুজুহু সিনাতুঁউ অলা নাউম।'
'তিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য কোনও উপাস্য নাই। তিনি চিরস্থায়ী, চিরজীবন্ত। তিনি কখনও ঘুমিয়ে পড়েন না।'
'হুয়াল লাহুলল্লাযি লাইলাহা ইল্লা হুয়া আলিমুল গাইবি অশ শাহাদাতি হুয়ার রাহমানুর রাহিম। হুয়াল্লাহুল্লাজি লাইলাহা ইল্লা হুয়া; আল্ মালিকুল কুদ্দুসুস্ সালামুল মু'মিনুল মুহাইমিনুল আজিজুল জাব্বারুল মুতাকাব্বির। সুব্হানাল্লাহি আম্মা ইয়ুশরিকুন। হুয়াল লাহুল খালিকুল বারিউল মুসাব্বিরু লাহুল আসমাউল হুসনা। ইউসাব্বিহু লাহু মা'ফিস্সামাওয়াতি অল আরদ্। অহুয়াল আজিজুল হাকিম।'
'তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনও উপাস্য নেই, তিনি দেখা অদেখা সব জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। তিনি আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনও উপাস্য নেই; তিনিই একমাত্র

প্রভু, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপশালী, মহামহিমান্বিত, মাহত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁকে যারা অংশীদার করে আল্লাহ তায়ালা তা থেকে পবিত্র।

তিনিই আল্লাহতায়ালা। স্রষ্টা, উদ্ভাবক, আকৃতিদাতা, উত্তম নামগুলো তাঁরই। নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।'

তিনি নিজের পরিচয় নিজেই দিচ্ছেন–

'কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল্ মুলকি, তুতিল্ মুল্কা মান তাশাউ। অতানজিউল মুল্কা মিম্মান্ তাশাউ; অতুইজ্জুমান তাশাউ অতু জিল্লুমান তাশাউ বিয়াদিকাল খাইরি। ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদির।'

'বলুন সমগ্র রাজত্বের মালিক আল্লাহ। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে রাজত্ব দান করেন। যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নেন। তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন যাকে ইচ্ছা অপমান করে দেন। তিনি মহাপরাক্রম শালী প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী।'

আল্লাহতায়ালা আরও পরিচয় দিচ্ছেন–

'তু লিজুল লাইলা ফিন নাহারি অতুলিজুন্ নাহারা ফিল্ লাইলি।'

'তিনি রাত্রিকে প্রবেশ করান দিনের ভিতর, দিনকে রাত্রির ভিতর।'

'অতুখরিজুল হাইয়া মিনাল মাইয়্যিতি অতুখরিজুল মাইয়্যিতা মিনাল্ হাইয়্যি।'

'তিনি জীবনের ভেতর থেকে বের করে আনেন মৃত্যুকে, মৃত্যুর ভিতর থেকে বের করে আনেন জীবনকে।'

আল্লাহতায়ালা তাঁর রাজত্ব দান করেছিলেন ফিরআউন (রামেসিস–দুই) কে।

কিবতী সম্প্রদায়কে। তারপর সেটা তুলে দিলেন বনী ইসরাঈল ও মুসা আলাইহিসসালামের হাতে। ফিরআউন সমুদ্রে খাবি খেতে খেতে মারা গেল। অথচ সে বলতো লোহিত সাগর আমার। আমিই সবচেয়ে বড় খোদা। নিজের সাগরে ডুবে মরলো সে ইঁদুরের মতো।

নমরুদকে রাজত্ব দিয়েছিলেন সামান্য সময়ের জন্যে। নির্দিষ্ট সময়ে তা ছিনিয়ে নিলেন।

ফিরাউন বেইজ্জত হলো পানিতে ডুবে মরে।

নমরুদ অপমানিত হলো জুতোর বাড়ি খেতে খেতে মরে।

'আমি এভাবেই সম্মানকে অপমান দিয়ে, অপমান কে সম্মান দিয়ে বদলে দিই।'

তিনি যাকে অপমান করতে চান কেউ তাকে পারেনা সম্মান দিতে। যদি দেশের সব সৈন্যবল, লোকবল তার পক্ষে থাকে তবুও। যদি গোটা পৃথিবী তার পক্ষে থাকে তবুও। যদি সমস্ত বিজ্ঞানজগত, জগতের যাবতীয় সম্পদ, ধন–রত্ন তার পক্ষে যাকে তবু তাকে আল্লাহতালা অপমান করে দেন। তার সিংহাসনে বসেই সে লাঞ্ছিত হয়ে যায়, তার ধন সম্পদের মাঝেই। যেমন কারুণ।

আল্লাহতায়ালা যাকে সম্মান দিতে চান তাকে কেউ অপমান করতে পারে না। সারা দুনিয়া, দুনিয়ার যতো ক্ষমতা, শক্তি ও প্রাণী, মানুষ ও জ্বিন যদি একসাথে তার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগে যে তাকে অপমান করে দেবে কিন্তু জগতের পরম প্রভু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাকে সম্মান দিবেন তো সে সম্মান পেয়ে যাবে। পৃথিবীর সবার কূট ষড়যন্ত্র, উদ্যোগ, পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ বানচাল হয়ে যাবে। তাকে বনে রেখে, পর্ণ কুটিরে রেখে কোনও রকমের দুনিয়াবী বস্তু ও অবলম্বন ছাড়া বাদশাহর সম্মান দিবে আল্লাহ তায়ালা।

তিনি রাত্রিকে প্রবেশ করান দিনের ভিতর। দিনকে রাত্রির ভিতর।

তিনি জীবন থেকে বের করে আনেন মৃত্যুকে। মৃতের থেকে বের করে আনেন জীবনকে।

জীবনের থেকে কিভাবে বের করেন মৃত্যুকে?

জীবিত মানুষ, জীবিত প্রাণ–চলে ফিরে বেড়াচ্ছিল হঠাৎ মৃত্যু হানা দিল তার মাঝে। মানুষটা এই মাত্র ঘুমিয়েছে, জেগেছে, খেলেছে, কথা বলেছে, মুগ্ধ চোখে দেখেছে। খুশিতে হেসেছে, দুঃখে কেঁদেছে আর এখন ঘুমুচ্ছে কিন্তু শ্বাস–প্রশ্বাস নেই। আর জেগে উঠবে না। হাত পা আছে, খেলতে পারবে না। মুখ আছে, কথা বলতে পারবে না। চোখ আছে, দেখতে পাবে না। কান আছে, শুনতে পাবেনা। খুশির ছোঁয়া লাগবে না, দুঃখে কাঁদবে না। হারিয়ে গেছে সব অনুভূতি। থেমে গেছে হৃদয়ের স্পন্দন।

নমরুদ ইব্রাহিম আলাইহিসসালামকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার আল্লাহর পরিচয় কি?'

'তিনি জীবন মৃত্যুর বিধান কর্তা।'

অট্টহাসি হেসে উঠলো সে। বললো, 'সে তো আমিও করতে পারি। এই–' সে ডাকলো জল্লাদকে, 'আগামীকাল যার ফাঁসি হবে তাকে মুক্তি দিয়ে দাও।'

মুক্তিপ্রাপ্ত লোকটার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। নমরুদ বললো,'ওই যে দেখো, কাল যে মারা যেত। আমি মৃত্যুর মাঝে জীবন দিয়ে দিলাম। এখন সে হাসবে, খেলবে, বাঁচবে। তারপর সে আবার একজন সৈনিককে ডাকলো, 'এই, যাও একজন নিরীহ, নিরপরাধ মানুষকে ধরে আনো।'

সৈনিক একজন বৃদ্ধকে ধরে আনলো। সে কাঁপছে।

'জল্লাদ–' ভীম দর্শন ভয়াল জল্লাদ কাছে এসে দাঁড়ালো, 'কতল করো।'

ইব্রাহিম আলাইহিসসালামের সামনেই বৃদ্ধের দেহ দু'টুকরো হয়ে গেল। রক্তে ভিজে গেল মেঝে।

'দেখো, কালও সে বেঁচে থাকতো। আমি তার জীবন কেড়ে নিলাম।' আঙুল তুলে মাথা ও দেহ আলাদা হয়ে যাওয়া রক্তাক্ত বৃদ্ধকে দেখাল নমরুদ। 'কাজেই জীবন ও মৃত্যুর বিধানকর্তা আমি।'

নাউজুবিল্লাহ্।

ক্ষমতা, সম্পদ ও মর্যাদা লোভী দুনিয়াদারের আত্মা যখন ঐশী আলো থেকে বঞ্চিত হয় তখন এমন চিন্তা ভাবনা তার মাথায় খেলে। এমনই নির্বোধ ও আহাম্মক হয়ে যায়।

তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই জীবন মৃত্যুর প্রকৃত বিধান কর্তা।

তিনি যেমন জীবনের ভিতর থেকে মৃত্যুকে বের করে আনেন তেমনি মৃত্যুর ভিতর থেকে বের করে আনেন জীবনকে।

কিভাবে?

মরা আঙুল, জীবনের কোনও অস্তিত্বই নেই তাতে। কিন্তু জীবিত নখ বেরিয়ে আসছে প্রতিদিন। মরা মাথা তার থেকে প্রতিনিয়ত বেরিয়ে আসছে জীবিত চুল। মরা মাড়ি জীবন পেয়ে তার থেকে বেরিয়ে আসছে দাঁত। মরা চিবুক, তার থেকে বেরিয়ে আসছে জীবিত দাড়ি।

মরা ডিম। ভিতরে সাদা আঁশ, হলুদ কুসুম। জীবনের কোনও অস্তিত্বই নেই। কিন্তু যখন একটা নির্দিষ্ট নিয়মে তার ওপর দিয়ে ওম্ দিচ্ছে মুরগী একুশ দিন পর্যন্ত। হঠাৎ ডিমের খোলস ফেটে বেরিয়ে আসছে জীবিত মুরগীর বাচ্চা। মৃত ডিমের ভিতর থেকে বের হচ্ছে জীবন পাওয়া মুরগীর বাচ্চা।

মরা চাঁদ, তার মরা কিরণ।

মরা সূর্য, তার মরা উত্তাপ। আলো। ছটা। রোদ্দুর।

মরা বৃষ্টি।

মরা ভূপৃষ্ঠ।

মরা মাটি।

মরা বীজ।

নির্দ্দিষ্ট দিন হঠাৎ জীবন পেয়ে মাটি চিরে বেরিয়ে আসে অঙ্কুর।

মরা অঙ্কুর থেকে ফুল। ফল। ফসল।

মরা ফসল গোলাজাত হয়।

মরা ধান বা গম।

তার থেকে মরা চাল বা মরা আটা।

তার থেকে মরা রুটি বা ভাত।

ওদিকে বাজার থেকে এলো পুঁই শাক, লাল- শাক, ডাঁটা শাক।
মরা ডাল।
মরা তেল।
মরা নুন।
মরা মরিচ।
মরা রুই, ইলিশ, পাঙ্গাশ, চিতল, আইড় বা চিঙড়ি মাছ। মরা গরু, খাসী বা মুরগীর গোশ্ত।
মরা ভাত, মরা ডাল, মরা মাছ, মরা গোশ্ত, মরা শাক চলে গেলো পেটের ভিতর। সেখানে মরা পাকস্থলীর নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় হজম হয়ে তৈরি হলো মরা পেশাব, পায়খানা। নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে গেল বর্জ্য পদার্থ। থাকলো রক্ত। হৃদপিন্ডের ছোট ও বড় হওয়ার মাধ্যমে রক্ত ছড়িয়ে পড়লো গোটা শরীরে। তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। রক্তের দৌড়াদৌড়ি ও ছোটাছুটির কারণে তৈরি হচ্ছে পিচ্ছিল পদার্থ। বীর্য। মরা বীর্য!
আল্লাহতায়ালা বলেন, 'আফারা আয়তুম মা তুমনুন।'
'তোমাদের ভিতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা ফোটাগুলো কি দেখেছ?'
'আ আন্তুম তাখ্লুকুনাহু আম্ নাহ্নুল খালিকুন।'
'ওগুলো কি তোমরাই তৈরি করেছ না আমি তৈরি করেছি।'
'আওলাম ইয়ারাল ইন্সানো আন্না খালাক্নাহু মিন নুত্ফা।'
'তোমরা কি দেখনা, মানুষকে আমি তৈরি করেছি এক ফোটা নাপাক পানি দিয়ে?'
'ফাইজা হুয়া খাসিমুম্ মুবিন।'
'তবুও তোমরা তর্ক করছো, ঝগড়া বিবাদ করছো?'
তো মরা বীর্য ঠাঁই পাচ্ছে পিতার আজল বা পিঠে। মায়ের বুকে।
এক আনন্দঘন রাতে পিতার পিঠ থেকে বীর্য তীব্র গতিতে ছুটে চলে যাচ্ছে যোনিনালী হয়ে গর্ভাধারে। শুক্রানু ও ডিম্বানু এক হচ্ছে। চল্লিশ দিন পর্যন্ত নুৎফাহ আকারে থাকছে। পরের চল্লিশ দিন মুয্গাহ আকারে। অর্থাৎ মাংস পিন্ড তৈরি হচ্ছে। পরের চল্লিশ দিনে তৈরি হচ্ছে হাত,পা, মুখ, মাথা, পেট, পিঠ-সব। এটা 'আলাকাহ্' এর অবস্থা। তারপর আচমকা একদিন রুহ ফুঁকে দেয়া হয়। বাচ্চা নড়া নড়া করে ওঠে।
ধীরে ধীরে মরা বীর্য থেকে তৈরি জীবিত শিশু লালিত পালিত হয় মাছের পেটের ভিতর।
মুখ দিয়ে নয়। মায়ের পেটের নাপাক রক্ত নাড়ি দিয়ে গ্রহণ করে শিশু। বেঁচে থাকে। পরম করুণাময় শিশুকে তার অসীম ক্ষমতা দিয়ে সম্মানিত ভাবে লালন-পালন করেন।
দশ মাস দশ দিন পর।
মায়ের জরায়ু ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে অপার বিস্ময়। এক জীবিত শিশু।
মরা পানির ভিতর মহাকৌশলময় চিত্রকর এঁকে দিলেন জীবন্ত ছবি। দুনিয়ার যত চিত্রকর-পাবলো পিকাসো, মাইকেল আঞ্জেলো, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, ভিনসেন্ট ভ্যানগগ, ফ্রান্সিস গঁগা, মাতিস-তাদের বইয়ে লিখেছেন 'জলের ভিতর ছবি আঁকা যাবে না।'
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের অক্ষমতাকে জানেন তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জলের ভিতর ছবি এঁকে দেখাবেন। জীবন্ত ছবি।
শিশু জন্ম নিয়েছে।
মা এখনও বেঁচে আছে। কিন্তু খানিক আগেই যেন মৃত্যু তাকে ছুঁয়ে গেছে। তীব্র যন্ত্রণা। মরণ যন্ত্রণা! শরীরের সব কটা স্নায়ু, রগ আর জোড়াকে তীব্র তীক্ষ্ণ ব্যথা দিয়ে জরায়ু ছিঁড়ে বের হয়েছে শিশু। ছিঁড়ে খুঁড়ে গেছে যোনী মুখ। এতো কষ্ট, এতো লজ্জা, এতো অপমান আর এতো রক্ত! মায়ের মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন কিন্তু বুক ভরা খুশি। কারণ কোল জুড়ে এসেছে দুনিয়া আলো করা আদরের ধন; সন্তান। সব ব্যথা, সব যন্ত্রণা ভুলে গেছেন তিনি।
আল্লাহ তায়ালা বলেন, দেখো মানুষ; চেয়ে দেখো! কী অবর্ণনীয় যন্ত্রণা আর সীমাহীন দুঃখ কষ্টের মাঝে তোমার মা তোমাকে জন্ম দিয়েছে। পাশে তার এক বালতি রক্ত! মা যে নিদারুণ কষ্ট পেয়েছে তাতে সাধারণ নিয়ম যে তার কষ্টের কারণ সন্তানটি তার এক নম্বর

দুশমন হয়ে যায়। কিন্তু দেখো, আমি তার মনের ভিতর দিয়ে দিয়েছি তোমার জন্যে মমতা। তোমাকে দেখার সাথে সাথে এক অনাবিল আনন্দে ভরে যায় তার অন্তর। আর বান্দা, তোর ক্ষুধা মেটানোর জন্যে দিয়ে দিলাম তোর মায়ের বুকে অমিয় ধারা। দুধ। এমন তরল যে গরমও নয় শীতলও নয়। যেন বান্দা তোর ঠোঁট, কচি মুখ পুড়ে না যায়। আর তোর কচি মুখ ঠান্ডায় না জমে যায়।
কেন এমন করলাম, বান্দা?
যেন তুই তোর জন্মলগ্ন স্মরণ করে বুঝতে পারিস কে তোকে লালন করে, কে তোকে পালন করে? কে তোর প্রতিপালক? তিনি কতটুকু দয়ালু। রাহমানুর রাহিম। কেমন রাজ্জাক।
এসব শেখালাম এজন্যে যে যখন তোর বিবেক হয়, জ্ঞানচোখ খোলে তুই আমার এইসব গুণাবলীর দাওয়াত দিস মানব জাতিকে। খেয়ে, না খেয়ে। পরে, না পরে। শীতে, গ্রীষ্মে, বর্ষায়। দিনের আলোতে, রাত্রির আঁধারে। দরিদ্র অবস্থায়, ধনী অবস্থায়। দেশে, বিদেশে। পথে-ঘাটে, বাজারে, বন্দরে, অফিসে, আদালতে, বাসে, উড়োজাহাজে, জাহাজে, নৌকায়, লঞ্চে, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, সুস্থ কিংবা অসুস্থ অবস্থায়। সেজন্যে ঘাম ঝরে ঝরুক, রক্ত ঝরে ঝরুক, মান যায় যাক, জান যায় যাক।
যেমন আমার হাবীব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন।
প্রথম সুরা 'আলাক' নাজিল হয়। এর তিন বছর পর মক্কার রাস্তা ধরে হাঁটছিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সময় মাটি ও আকাশের মাঝামাঝি জায়গায় দেখা হলো জিব্রাঈল আমিনের সাথে।
নাজিল হলো দ্বিতীয় সুরা।
'ইয়া আইয়্যুহাল মুদ্দাস্সির। কুম্ ফাআন্জির। অরাব্বিকা ফাকাব্বির।'
'হে কম্বলাবৃত! উঠুন। ভয় দেখান মানুষকে। আর শোনান আপনার প্রতিপালকের গৌরব ও অহঙ্কারের কথা!'
তারপর তেইশ বছর পর্যন্ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর বিশ্রাম নেন নি, ঠিকমতো খান নি। শুধু অপরের কাছে দাওয়াত পৌছানোর জন্যে। দাওয়াতের আমাল ক্বিয়ামাত পর্যন্ত সচল করার জন্যে। নিজেকে নিঃশেষ করলেন। ঘাম দিলেন, রক্ত দিলেন। সাথীদেরকে আত্মবলিদানে উদ্বুদ্ধ করলেন। ফোরাত নদীর পানি লাল হলো সাহাবা (রাঃ) 'র রক্তে।
তো ভাই উম্মত হিসেবে আমারও ওই একই কাজ। দাওয়াত। কীসের দাওয়াত?
আল্লাহর পরিচয়। তার জাত সম্পর্কে ও সীফাত বা গুণাবলী সম্পর্কে। আর নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম এর পরিচয়। কে তিনি? কি তাঁর পরিচয়? আমাদের জন্যে তিনি কি করেছেন আর আমি তাঁর জন্যে কি করতে পারি।
তো জন্মলগ্নে মায়ের অন্তরে দিলেন মমতা আর বুকে দিলেন দুধ।
সারা জীবন প্রকাশ করতে হবে সেই নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা।
এখন আল্লাহর পরিচয় কি?
তিনি জীবন ও মৃত্যুর বিধান কর্তা।
তিনি জীবনের ভিতর থেকে বের করেন মৃত্যুকে। আর মৃত্যুর ভিতর থেকে বের করেন জীবন।
তিনি মরা সব উপাদান দিয়ে তৈরি মরা বীর্যের এক ফোঁটা থেকে তৈরি করলেন জীবন্ত শিশু।
জীবন ও মৃত্যু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সৃষ্টি।
অলঙ্ঘনীয় ও অলৌকিক দুটি নিয়ম।
আল্লাহ তায়ালা রাব্বুল আলামীন মহান স্রষ্টা।
তিনি বিভিন্ন বিচিত্র প্রাণীকূল তৈরি করেছেন। আফ্রিকার গহীন অরণ্যে এক ধরনের প্রাণী রয়েছে। এদের নাম প্লানটুন। প্লানটুন পাঁচটা উটের সমান। সে ক্ষুধার্ত হলে এক পোয়া

আফ্রিকান পিঁপড়া খেয়ে নেয়। তার খিদে মিটে যায়। এক ধরনের পাখি রয়েছে যেগুলো ডিম পাড়ে। ডিমের আয়তন পাঁচ কাঠার মতো। ডিম পাড়ার সময় হলে মহাশুন্যে উড়ে যায়। মেঘের দেশে। সেখানে সে ডিম পেড়ে দেয়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে ডিম প্রবল গতিতে নেমে আসে নিচের দিকে।

ডিমের সাথে সমান্তরালভাবে নেমে আসে পাখি। তার সুতীক্ষ্ণ চোখ দৃষ্টি মেলে দেয় ডিমের ওপর। আকাশ আর মাটির মাঝপথে থাকা অবস্থায়ই ফাটল ধরে ডিমের গায়ে। দৃষ্টি ক্রমশঃ তীক্ষ্ণ হয়। তার দৃষ্টির তীব্র প্রভায় ধীরে ধীরে খুলে যায় খোলস। বেরিয়ে পড়ে বাচ্চা পাখি। ডানা ঝাপটিয়ে উড়াল দেয় অজানা দেশে।

একদিন হযরত মুসা আলাইহিসালাম আল্লাহতায়ালাকে বললেন, 'হে আল্লাহ, এই আসমান জমীন কে সৃষ্টি করেছেন?'

'আমি।' আল্লাহতায়ালা বললেন।

'কুল মাখলুক, সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা কে?'

'আমি।' বজ্রনির্ঘোষ উত্তর।

'এই দুনিয়ার সমস্ত মানুষ তোমার বিরুদ্ধে। কোনও একজনও নেই যে তোমাকে মানে। অবাধ্য। তুমি কি করবে?'

'সবাইকে ধ্বংস করবো দুনিয়াতে, সৃষ্টি করবো নতুন জাতি। আখিরাতে দিব জাহান্নাম।'

'এই দুনিয়ার সমস্ত জ্বিন তোমার বিরুদ্ধে। কেউ তোমার হুকুম মানতে চায় না। কি করবে তুমি'?

'ধ্বংস করে জাহান্নামে দিব। সৎ, অনুগত জ্বিন সৃষ্টি করবো।'

'হে আল্লাহ, চন্দ্র তোমার কথা শোনে না, সূর্য পূর্বদিকে উদয় হয় না। পশ্চিমে অস্ত যায় না। জোয়ারের সময় ভাটা, ভাটার সময় জোয়ার। রাত্রির সময় দিন, দিনের সময় রাত। শীতের সময় গরম, বসন্তের সময় বর্ষা। বনের হিংস্র পশুরা তোমাকে মানে না। সমুদ্রের জীব জানোয়ার শোনে না তোমার কথা। পাহাড়-পর্বত গ্রহ নক্ষত্র সব তোমাকে অস্বীকার করেছে। গোটা বিশ্ব তোমার বিপক্ষে। বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। কী করবে তুমি সেক্ষেত্রে?'

'একটা ছোট পোকা আছে আমার কাছে।' শান্ত স্বরে বললেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন।

'হে আল্লাহ, সামান্য একটা পোকা কি করতে পারে?'

'এক লোকমায় সমগ্র বিশ্বব্রহ্মান্ডকে গ্রাস করে নেবে সে।'

বিস্ময়ে হতবিহ্বল হয়ে গেলেন মুসা আলাইহিসসালাম।

'হে আল্লাহ! সেই পোকাটি থাকে কোথায়?' বিমূঢ় মুসা (আঃ) কাঁপা স্বরে শুধালেন।

'এক চারণ ভূমিতে।'

'চারণভূমি!'

'বিশাল এক চারণভূমিতে হাজার হাজার পোকা চরে বেড়াচ্ছে।'

'কোথায় সেই চারণভূমি?

'আমার জ্ঞানের রাজ্যে।'

'আমি দেখতে চাই।'

'তুমি তা পারো না। তোমার মস্তিষ্ক এতো বড় সৃষ্টির অস্তিত্বকে দেখতে পারে না। ধারণ করতে পারে না।'

হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালাম একবার আল্লাহ তায়ালাকে আরজ করলেন,

'হে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। তুমি তো রাজ্জাক, রিযিকদাতা।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'রিযিকের ভার আমি নিতে চাই।'

'সুকঠিন দায়িত্ব। তুমি পারবে না।'

'মাত্র তিনদিনের জন্যে।'

'বেশ, দিলাম।'

'হে আল্লাহ, আমাকে সাহায্যকারী দাও।'

'দিলাম। জ্বিন, মানব, হাওয়া ও বিহঙ্গকূল কে।'

সুবিশাল এক লঙ্গর খানায় তৈরি হচ্ছে খাবার-দাবার। হাতী তার শাবককে নিয়ে পরিতৃপ্ত সহকারে খেয়ে চলে গেল। সিংহ তার শাবককে নিয়ে। সবাই খুশি। সূর্য যখন সাগরের বুকে ডুবু ডুবু। লাল--কমলা আবীর ছড়াচ্ছে। হযরত সোলায়মান আলাইসিসালাম যবুর কিতাব তিলাওয়াতে নিমগ্ন। ঠিক তখন অন্ধকার হয়ে গেল দুনিয়া। দশ দিগন্ত আঁধার করে মহাসমুদ্রের অতল তলা থেকে উঠে এলো অতিকায় এক প্রাণী।

ধীর পদক্ষেপ সে এগিয়ে গেল সোলাইমান আলাইহিস সালামের কাছে। সালাম দিল। বলল, 'খিদে পেয়েছে আমার।'

'বেশ, যাও লঙ্গর খানায়।'

এগিয়ে গেল অতিকায় প্রাণী। ফিরে এলো একটু পরেই। তার চেহারায় বিরক্তির ছাপ। বোঝা যায় তার খিদে মেটেনি।

'সোলায়মান আলাইহিসসালাম-' সে আর্তনাদ করে উঠলো, 'আমার খিদে মেটেনি।'

'কেন? লঙ্গর খানায় খাবার নেই?'

'না।'

'লক্ষ জ্বিন, মানব, বাতাস, পাখী যেখানে প্রতিমুহূর্ত খেটে যাচ্ছে সেখানে খাবার নেই?'

'না।'

'এতো বিশাল খাদ্য ভান্ডার গেল কোথায়?'

'আমার পেটে।'

'কি?!'

'হ্যাঁ, ওটা ছিল আমার এক লোকমার খাবার।'

'কি বলছো, তুমি?'

'জ্বি। পেয়ারা নবী। আমাদের আল্লাহ এমন তিনটি লোকমা প্রতিদিন দু'বার করে খেতে দেন আমাদের।'

'দু'বার!'

'জ্বি। দু'বার আমাকে একা নয় আমার মতো অসংখ্য প্রাণীকে সাগরের তলায় লালন পালন করেন তিনি।'

সুব্হানাল্লাহ।'

'জ্বি। আজ পেলাম এক বেলার এক লোকমা মাত্র। খিদে নিয়ে ফিরে যাচ্ছি ,হে মহামানব। আর মূর্খতা করবেন না। এখনই সিজদায় পড়ে জগতের প্রতিপালককে তাঁর দায়িত্ব দিয়ে দিন।'

সোলায়মান আলাইহিসসালাম তাই করলেন।

তো ভাই স্রষ্টার কতশত অজানা সৃষ্টি মানুষের অগোচরে রয়ে গেছে। কেউ জানে না।'

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিচিত্র সৃষ্টি মানুষ।

মানুষকে আল্লাহতায়ালা সৃষ্টির সেরা সৌন্দর্য দিয়ে তৈরি করেছেন। তিনি বলেন-

'লাক্বাদ্ খালাক্নাল ইন্সানা ফি আহসানি তাক্বীম।'

'আমি মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর আকৃতি দিয়ে তৈরি করেছি।'

চিন্তা করে দেখুন চোখের কথা। ঠিক ঠিক মতো জায়গায় বসিয়ে দিয়েছেন। নাকটি ঠিক মতো সাজিয়েছেন। যদি নাককে বুকে এনে দিতেন তাহলে কতই না বিদঘুটে ব্যাপার ঘটে যেতো। একটা চোখকে মাথার পেছনে আরেকটি চোখকে কপালে বসিয়ে দিলে মানুষকে ভুতুড়ে মনে হতো। একটা হাত বুকে অন্য হাতটি পিঠে বসিয়ে দিলে কোন কাজই মানুষ সঠিক ও সহজভাবে সম্পাদন করতে পারতো না। একটা পা মাথায় একটা পা নিচে দিলে অনাসৃষ্টি হয়ে যেতো। মুখকে পেটে আনলে বীভৎস দেখাত।

আল্লাহ তায়ালা তা করেনেনি।

তিনি অপরূপ করে তৈরি করেছেন মানুষকে।

জনৈক বাদশা ও তার স্ত্রী রাত্রি বেলায় রাজপ্রাসাদের ছাদে বসে চাঁদের আলোয় অবগাহন করছিলেন। এক সময় আবেগ মথিত হয়ে বাদশা বলে ফেললেন, 'রাণী তুমি এই চাঁদের চেয়ে সুন্দর।'

'তা যদি না হই?' ছলনা করে বললেন রাণী।

'না হলে তোমাকে তিন তালাক।'

শুনে শিউরে উঠে রাণী বললেন, 'প্রমাণ করবে কি দিয়ে?'

রাজাও এবার যেন একটু বাস্তবে ফিরে এসেছেন। বললেন, 'দেখি।'

দেশের গণ্যমান্য আলেমদের ডাকলেন তিনি।

সবাই স্তব্ধ। মানুষ যে চাঁদের চেয়ে সুন্দর কেমন করে প্রমাণ করবেন। কেউ কোনও সহজ কিছু পাচ্ছেনা।

দেশের সবচেয়ে বড় আলেম এরও ডাক পড়েছে। তিনি ও কিছু ভেবে পাচ্ছেন না। খুঁজে পাচ্ছেনা কোরান হাদীসের কোথায় এ সম্পর্কে পাবেন। হঠাৎ তার মনে হলো, তাঁর কাছে যে অল্প বয়সের কিশোর ছেলেটি পড়ে সে খুবই মেধাবী। সুতীক্ষ্ণ তার চিন্তা শক্তি। কোনও উপায় না পেয়ে তিনি রাত্রি বেলায় চলে গেলেন সাগরিদের বাসায়।

তাকে জানালেন জরুরী অবস্থা।

দেশের বাদশার বিবির তালাক হয়ে যাচ্ছে। কি করা?

এই কিশোর ছেলেটি হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা (রঃ)। তিনি বললেন, 'ওস্তাদজী অস্থির হবেন না। বাড়ি যান। আগামীকাল দেশের সব বরেণ্য আলেমদের একত্রিত করুন। এশার নামাজের সময়ে। উত্তর দিয়ে দেব। তালাক হবে না বাদশার।'

এশার নামাজের সময় একত্রিত হলেন সবাই।

'নামাজ পড়াবো আমি।' কিশোর বললেন।

'তুমি!' সবাই সমস্বরে বললেন, 'এতো বড় বড় আলেম থাকতে?'

'জ্বি। নামাজে ইমামতি দিলেই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন আপনারা।'

'বেশ। তবে তাই হোক।' সবাই বললেন।

সুরা ফাতিহার পর ইমাম আবু হানিফা (রঃ) পড়লেন 'আততীন'। 'লাক্বাদ খালাক্বনাল্ ইন্সানা ফি আহ্সানি তাক্বীম'-আয়াতে এলেন। কিন্তু তিনি পড়লেন, 'লাক্বাদ খালাক্বনাল্ ক্বামারা ফি আহ্সানি তাক্বীম।'

মুক্তাদি লোকমা দিলেন।

তিনি আবার একই উচ্চারণ করলেন।

মুক্তাদিরা আবার লোকমা দিলেন।

এভাবে কয়েকবার পড়ার পর তিনি নামাজ ছেড়ে দিলেন। বললেন, 'আপনারা নিজেরাই লোকমার মাধ্যমে প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। আপনারাই কোরানের স্বাক্ষী দিয়ে বলেছেন, মানুষকে আল্লাহ সবচেয়ে সুন্দর করে তৈরি করেছেন। স্বয়ং আল্লাহতালা যখন বলছেন শুধু চাঁদ নয় যাবতীয় সৃষ্টির চেয়ে আমি মানুষকে সুন্দর করে তৈরি করেছি। তখন বাদশার স্ত্রী তালাক হয় কি করে?'

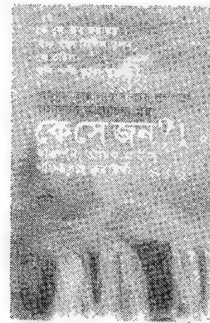
সবাই একই সাথে বিস্মিত ও খুশি হলেন।

বাদশাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

মানুষের কাছাকাছি আরেকটি জাতি সৃষ্টি করেছেন তা হচ্ছে জ্বিন।

জ্বিন মানুষের চেয়েও বেশি। আগুন দিয়ে তৈরি। তাদের খাবার হচ্ছে ধোঁয়া। একজন মানুষের চেয়ে তারা শক্তিমান, দ্রুতগামী। যে কোনও আকার নিতে সক্ষম।

জ্বিন জাতিকে একবার সমূলে ধ্বংস করা হয়েছিল। পাপাচারের কারণে। এখনও জ্বিন জাতি প্রচুর অনিষ্ট করে থাকে।



নয়

আল্লাহতালার সবচেয়ে নিকটতম ও অনুগত সৃষ্টি হচ্ছে ফিরিশতা। তারা নূরের তৈরি।

তিরমিজিতে হাদিস-ই-হাসান বলে আখ্যায়িত এই হাদিসটি আসছে-

'অ আন্ আবি জ্বার রাদিয়াল্লাতালাআনহু ক্বালা ক্বালা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম, আত্তাতিস্ সামাউ অহুক্কা লাহা আন তাঈত্তা মা ফিহা মাও দিউ আরবাঈ আসাবিআ ইল্লা অফিহি মালাকুন শাজিদুন লিল্লাহি তা'আলা অল্লাহি লাও তা'লামুনা মাআ'লামু লাদাহিকতুম কালীলাঁও অলা বাকায়তুম কাসিরান অমা তালাজ্জাজ্তুম বিনুনিসাঈ আলাল ফুরুশি অআখারাতুম ইলাস্ সুউ'দাতি তাহ্আরুনা ইলাল্লাহি তায়ালা।'

'আবু জ্বর গিফারী (রাঃ) থেকে বলা হয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন "আসমান কেঁপে উঠলো। কারণ, আসমান নিশ্চয় আল্লাহর ভয়ে কেঁপে ওঠার উপযুক্ত। আকাশে চার আঙ্গুল মতো জায়গা নেই যেখানে কোনও মালাইকা (ফিরিশতা) আল্লাহকে সিজদা করছে না। ---।'

মুসলিম, তিরমিজি ও নাসায়ী গ্রন্থে একটা হাদীসে পাক রয়েছে-

'ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'আমাকে আনসারদের এক সাহাবী বলেছেন, এক রাতে তারা নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর সাথে বসেছিলেন। আচমকা একটা তারা ছিটকে পড়লো আর জ্বলে উঠলো আগুনের মতো। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'তারা যখন এমন করে ছিটকে পড়ে তখন তোমরা কি বলো?' উত্তর তারা বললেন, 'আমরা বলে থাকি, 'আজ রাতে একজন মহামানব জন্মগ্রহণ করেছেন বা মৃত্যুবরণ করেছেন।'

তিনি বললেন, তারা কখনও কারও জন্ম বা মৃত্যুর কারণে ছিটকে পড়ে না। আসলে মহান আল্লাহতায়ালা যখন কোনও কাজ করেন তখন আরশ বয়ে চলা ফিরিশতারা আল্লাহর প্রশংসা পাঠ করেন। সাথে সাথে তার কাছের ফিরিশতারাও আল্লাহর প্রশংসা পাঠ করেন। এমনটি শেষ আকাশের ফিরিশতারাও তাসবীহ পাঠ করেন। তারপর তারা আরশ বহনকারীদের জিজ্ঞেস করেন, 'কি বলেছেন পরমপ্রভু?' তারা সংবাদ বলে দেয়। এভাবে একে অন্যের কাছ থেকে খবর জানতে পারেন আকাশবাসীরা। এমনি এ খবর শেষ আকাশের বাসিন্দারা জানতে পারে। তারপর খুবই গোপনে জ্বিনেরা শোনে সে সংবাদ। আর তাদের অনুসারীদের কাছে পৌঁছে দেয়। কাজেই, যে সংবাদটুকু তারা দৈববাণী থেকে শোনে তা সত্য। যা তারা সঠিকভাবে বলে তা সত্য। কিন্তু তারা এর সাথে মিথ্যা বলে আর বাড়িয়ে বলে।'

মুসলিম শরীফে আম্মাজান আয়শা (রাঃ) থেকে বলা হয়েছে, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, ফিরিশতারা নুরের তৈরি, আর জ্বিনদের সৃষ্টি করা হয়েছে ধোঁয়া ছাড়া আগুন দিয়ে। আর আদম জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে এমন জিনিস দিয়ে যা তোমাদের বলা হয়েছে।'

মিরাজ সম্পর্কে হাদিস দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর সামনে 'বায়তুল মামুর' উপস্থিত করা হয়েছিল। এটি সপ্ত আকাশে। প্রত্যেক দিন তাতে তাওয়াফ করে সত্তুর হাজার ফিরিশতা। তারা দ্বিতীয়বার সুযোগ পায় না।

মুহম্মদ ইবনে নাসির, ইবনে আবি হাতিম, ইবনে জারীর এবং আবু আল শায়েখ থেকে বর্ণনা করেছেন, আম্মাজান আয়িশা (রাঃ) বলেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, 'আসমানে ফিরিশতা ছাড়া পা রাখার জায়গা নেই। গোটা আকাশ জুড়ে ফিরিশতারা সিজদা আর কওমা অবস্থায় রয়েছেন।'

আবু দাউদ, বায়হাকী বর্ণনা করেন, জাবির (রাঃ) থেকে বলা হয়েছে, 'নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, আমাকে আরশ বয়ে নিয়ে চলা ফিরিশতাদের একজন সম্পর্কে কিছু বলতে অনুমতি দেয়া হয়েছে। তার কানের লতি থেকে ঘাড় পর্যন্ত সাত শত বছরের রাস্তা।'

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'লাই ইয়াশ্‌তান্‌কিফাল মাসিহু আই ইয়াকুনা আ'বদান লিল্লাহি অলাল মালাইকাতিল্ মুকাররাবুন।'

'মাসীহ ঈসা আলাইহিস্সালাম কখনও আল্লাহর বান্দা হতে অস্বীকার করেননি। আর তার নিকটতম ফিরিশতারাও আল্লাহর বান্দা হতে অস্বীকার করেনি। আর ফিরিশতাদের কাউকে আসমানের অধিবাসী বলা হয়। তারা রাত দিন সকাল সাঁঝে ও সারাক্ষণ আল্লাহর ইবাদাতে ব্যস্ত রয়েছে।'

অন্য জায়গায় আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'ইয়ুসাব্বিহুনাল লাইলা অন্নাহারা লা ইয়াফ্‌তুরুন।'

'তারা দিন-রাত আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করে। কিন্তু তারা ক্লান্ত হয় না কখনও।'

তাদের মাঝে কেউ কেউ একের পর এক প্রদক্ষিণ করে বায়তুল মামুর। এদের কেউ রয়েছে জান্নাতের দেখা শোনার জন্যে। বেহেশত বাসীদের সম্মান জানানোর কাজে। আবার কেউ নিয়োজিত রয়েছে জাহান্নামের জন্যে। তাদের নাম 'জাবানিয়া'। তাদের সর্দার হলে উনিশ জন। দোজখ রক্ষকের নাম 'মালেক'। তিনি ওই উনিশ জনের সর্দার।

তাদের সম্পর্কে আল্লাতায়ালা জান্নাশানুহু বলেন, 'অক্বালাল্লাজিনা ফিন্নারি লিখাজানাতি জাহান্নামাদ্'উ রাব্বাকুম ইয়ুখাফ্‌ফাফ্ আন্না ইয়াওমান্ মিনাল্ আজাব।'

'জাহান্নামিবাসীরা প্রহরীকে বলবে, তুমি তোমার প্রতিপালককে বলো, তিনি যেন একদিনের জন্যে আমাদের শাস্তি কমিয়ে দেন।'

আরেক জায়গায় বলেন, 'অনাদাও ইয়া মালিকু লিইয়াক্‌দি আ'লাইনা রাব্বুকা ক্বালা ইন্নাকুম মা কিসুন।'

দোজখীরা চিৎকার করে বলবে, 'হে মালেক, তুমি তোমার প্রতিপালককে বলো যেন মৃত্যু দান করেন। উত্তরে তিনি বলবেন, 'চিরকাল বেঁচে থাকবে তোমরা।'

আরেক জায়গায়ে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'আলাইহা মালাইকাতু গিলাজু শিদাদু লাইয়াসুনাল্লাহা মা আমারাহুম অইয়াফ্‌আলুনা মা ইয়ুমারুন।'

'দোজখে ভয়ংকর চেহারার ও নিষ্ঠুর হৃদয়ের ফিরিশতারা আছে যারা কখনও আল্লাহকে অমান্য করেনা, তারা শুধু আল্লাহর হুকুম মেনে চলে।'

অন্য জায়গায় বলেন, 'আলাইহা তিশ্‌আতা আশারা অমা জাআল্‌না আসহাবান্ নারি ইল্লা মালাইকাতান্ ইলা কাওলিহি অমা ইয়ালামু জুনুদা রাব্বিকা ইল্লা হুয়া।'

'দোজখে উনিশ জন বিকটাকৃতির ফিরিশ্‌তা আছে। আর দোজখের ফিরিশতাদের আমি আশ্চর্য ও অদ্ভুত আকারে সৃষ্টি করেছি। আর আল্লাহর সৈন্য সামন্ত সম্পর্কে তিনি ছাড়া অন্য কেউ ভাল জানে না।'

কিছু ফিরিশতা আছেন যারা মানবজাতির দেখা শোনার দায়িত্বে ব্যস্ত থাকেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'লাহু মুআক্‌কাবাতু মিন্ বায়নি ইয়াদায়হি অমিন্ খাল্‌ফিহি ইয়াহ্‌ফাজুনাহু মিন্ আম্‌রিল্লাহ।'

'মানুষের সামনে পেছনে পালা করে ঘিরে আছে ফিরিশতারা। ওরা আল্লাহর আদেশে মানুষকে নিরাপদ রাখছে।'

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'কিছু ফিরিশ্‌তা মানুষের সামনে ও পেছনে পাহারা দিচ্ছে। যখন আল্লাহ আদেশ দিবেন সাথে সাথে তারা সরে পড়বে।'

মুজাহিদ (রঃ) বলেন, কোনও মানুষ ফিরিশতাদের নিরাপত্তা থেকে দূরে নয়। তারা মানুষকে ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থায় জ্বিন, দুষ্ট মানুষ ও পোকা মাকড়ের অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ রাখে।

ফিরিশতাদের কেউ বান্দার আমল লক্ষ্য করার কাজে নিয়োজিত আছেন।

আল্লাহতায়ালা বলেন, 'ইজ্ ইয়াতালাক্কাল মুতালাক্‌কিয়ানি আ'নিল ইয়ামিনি অ আ'নিশ্ শিমালি ক্বায়ীদুন্ মা ইয়াল্‌ফিজু মিন ক্বাওলিন ইল্লা লাদায়হি রাক্বিবুন আ'তীদ।'

'যখন ডান ও বাঁয়ের দু'জন ফিরিশতা একে অন্যের সাথে দেখা করে, ওই লোক যা বলবে আর করবে, তাই তারা সংরক্ষিত করে রাখে।'

আরেক জায়গায় আল্লাহতায়ালা বলছেন, 'অইন্না আ'লাইকুম্ লা হাফিজিনা কিরামান কাতিবিনা ইয়ালামুনা মা তাফ্‌আলুন।'

'নিশ্চয়ই রয়েছে তোমাদের জন্যে পাহারাদার। তারা সম্মানিত লেখক। তোমরা যা করো তারা তা জানে।'

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বলা হয়েছে; রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তোমাদের নগ্ন হতে নিষেধ করছেন। কাজেই তোমরা ফিরিশতাদেরকে লজ্জা করো। যারা তোমাদের সাথী, অতি সম্মানিত আর আমলনামার লেখক। ওরা তিন সময় ছাড়া তোমাদের থেকে আলাদা হয় না। পায়খানা, পেশাব, স্ত্রী-সহবাস আর গোসলের সময়। তোমরা যখন খোলা জায়গায় গোসল করো তখন কাপড়, দেয়াল বা অন্য কিছু দিয়ে নিজেদের আড়াল করে নেবে।'

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে বলেন, 'তোমাদের কাছে রাত দিন পালা করে আসা যাওয়া করেন ফিরিশতারা। তারা ফজর ও আসরের সময় একত্রিত হন। যারা তোমাদের সাথে রাতে থাকে তারা ভোরে আকাশে উঠে যায়। আল্লাহতায়ালা তাদের জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা আমার বান্দাদের কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছো?' অথচ তিনিই বেশি জানেন। তখন ফিরিশতারা উত্তর দেয়, 'ওদেরকে নামাজ পড়তে দেখে এসেছি আর নামাজরত অবস্থায় ওদের কাছে গিয়েছিলাম।'

অন্য জায়গায় আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, তোমরা ইচ্ছে করলে পড়তে পার-

'অ কুরআনাল ফাজ্‌রি ইন্না কুরআনাল্ ফাজ্‌রি কানা মাশ্‌হুদা।'

'ফজরের নামাজে কোরআন তিলাওয়াত করো; নিশ্চয়ই এ তিলাওয়াত সাক্ষ্য হবে।'

তো ভাই,

লক্ষ কোটি ফিরিশতা!

একবার শয়তানের সাথে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাক্ষাৎকার হলো। অনেক কথা। এক পর্যায়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার অনুচরদের সংখ্যা কতো?'

'শয়তান বলল, 'আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আপনার সাথে মিথ্যা না বলার জন্যে। শুনুন তাহলে, এই দুনিয়াতে যত মানুষ আছে তার দশ গুণ পাখি। যতো পাখি আছে তার চেয়ে দশ গুণ হচ্ছে জীব-জানোয়ার, জীব-জানোয়ার যতো আছে তার চেয়ে দশগুণ জ্বিন, তার চেয়ে দশগুণ শয়তান। আর শয়তানের চেয়ে দশগুণ ফিরিশতা।'

তো,

লোমকূপে লোকমূপে ফিরিশতা।

পাতায় পাতায় ফিরিশতা।

কোরানের প্রতিটি আয়াত হিফাজতের জন্যে ফিরিশতা।

অসংখ্য, অগণিত।

আল্লাহর তৈরি প্রাণের দেখা শোনা, নিয়ন্ত্রণের জন্যে ফিরিশতাদের সৃষ্টি।

শ্রেষ্ঠ ফিরিশতা জিব্রাঈল, মিকাঈল, ইসরাফিল ও আজরাইল আলাইহিসসালাম। ইসরাফিল (আঃ) কে প্রলয় শিঙ্গা বাজানোর জন্যে আর আজরাইল (আঃ) কে জান কবজের জন্যে। 'মালাকুল আরহাম' নামে এক ধরনের ফিরিশতা আল্লাহতায়ালা সৃষ্টি করেছেন। গর্ভে যখন শিশু তখন এই ফিরিশতা তার রক্ত ও মাংসের সাথে মৃত্যু-স্থানের মাটি মিশিয়ে দেন। ওই মিশ্রিত মাটি একদিন মানুষটিকে টেনে আনে মৃত্যুর জায়গায়। সেখানেই সে মারা যায়।

আল্লাহতায়ালা বলেন, 'কুল্‌লাও কুনতুম ফি বুইউতিকুম লাবারাল্লাজিনা-কুতিবা আলাইহিমুল কাত্‌লু ইলা মাদাজিয়িহিম।'

'হে নবী। আপনি বলে দিন, তোমরা যদি তোমাদের ঘরের ভিতরেও থাক তবু যার যেখানে মৃত্যু আছে তাকে অবশ্যই সেখানে যেতে হবে।'

বলা হয়েছে, হযরত আযরাঈল (আঃ) নবীদের সাথে দেখা করতে আসতেন। একবার তিনি সোলায়মান (আঃ) এর দরবারে আসেন। সেখানে বসা একজন সুশ্রী যুবকের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন। যুবকটা ভয় পেয়ে গেল।

আযরাইল (আঃ) চলে যাবার পর যুবক বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমার অনুরোধ। আপনার বাতাস যেন আমাকে এখনই চীন দেশে পৌঁছে দেয়।'

খানিকক্ষণের মধ্যেই চীনে এসে পড়ল যুবক। আর তার একটু পরই আজরাঈল (আঃ) আবার হাজির বাদশার দরবারে।

'ব্যাপার কি?' সোলায়মান (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'ছেলেটাকে কড়া চোখে দেখার কারণ কি?'

'কারণ ওই দিনই তার জান কবজ করার জন্যে আল্লাহ আমাকে আদেশ করেন।'

'ভালো কথা।'

'কিন্তু আপনার দরবারে নয়, চীন দেশে।'

'সুব্‌হানাল্লাহ!'

'আপনার দরবারে তাকে দেখে অবাক হই। সে ভয় পায়। তারপর বাতাসের আগে পৌঁছে যাই চীন দেশে। ততক্ষণে সেও পৌঁছে গেছে। নির্দিষ্ট জায়গায় তার জান বের করে নিই।'

এক লোক সব সময় দোয়া করতো 'হে খোদা, আমাকে আর সূর্যের তত্ত্বাবধায়ক ফিরিশতাকে ক্ষমা করো।'

আল্লাহর অনুমতি নিয়ে একদিন সেই ফিরিশতা ওই লোকের কাছে এলেন। তিনি বললেন, 'বন্ধু আপনি আমার জন্যে কেন দোয়া করেন?'

'আমার একান্ত ইচ্ছা আপনি আমাকে আপনার জায়গায় নিয়ে যান। আর একটা ইচ্ছা হচ্ছে, আমার মৃত্যুর সময়টা ঠিক কখন তা আজরাইলের কাছ থেকে জেনে আমাকে বলে দেন।'

ফিরিশতা তাকে সেখানেই নিয়ে গেল। এবার আযরাইল (আঃ) এ কাছ থেকে মৃতুক্ষণ জানার পালা। তিনি আযরাঈল (আঃ) কাছে গেলেন। আযরাঈল (আঃ) বললেন, তার মৃত্যু হয়েছে। নির্ধারিত ছিল যে সে সূর্যে না আসা পর্যন্ত তার মৃত্যু হবে না।'

ফিরিশতা এসে দেখল সত্যিই ওই লোকটির মৃত্যু হয়েছে।

হযরত মাকাতিল (রাঃ) বলেন, সাত আসমানে কিংবা চতুর্থ আসমানে সত্তর হাজার খুঁটির ওপর একটা সিংহাসন তৈরি করেছেন আল্লাহতায়ালা। নুরের তৈরি। এই সিংহাসনে বসিয়েছেন হযরত আযরাঈল (আঃ) কে।

আযরাঈল (আঃ) এর শরীরে চারটি পাখা।

তার গোটা দেহে দুনিয়াতে যত প্রাণী আছে তার সমান চোখ।

তার সমান জিভ।

ওখানে বসেই তিনি সবার প্রাণ ছিনিয়ে নেন।

একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, 'মালাকুল মাউতের ডানে বাঁয়ে, উপরে নিচে, সামনে ও পেছনে ছ'টি মুখ রয়েছে।

'ইয়া রাসুলুল্লাহ! ছয়টি মুখ কেন?' সাহাবা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন।

তিনি (সাঃ) বললেন, ডানের মুখ দিয়ে পাশ্চাত্যের, বাঁয়ের মুখ দিয়ে প্রাচ্যের প্রাণীদের জান কবজ করেন। সামনের মুখ দিয়ে মোমেন, বাঁয়ের মুখ দিয়ে পাপীদের, উপরের মুখ দিয়ে আকাশ মন্ডলীর আর নিচের মুখ দিয়ে জ্বিন ও দানবের রুহ ছিনিয়ে নেন।

এমন করে কোন একটা প্রাণীর মৃত্যু হলেই আযরাঈল (আঃ) এর দেহের একটা চোখ খসে পড়ে।

এক হাদিস পাকে বলা হয়েছে, আযরাঈল (আঃ) এর চারটি মুখ।

মাথার ওপরের মুখ দিয়ে নবী ও ফিরিশতাদের আত্মা, সামনের মুখ দিয়ে মুমিন বান্দাদের, পিছনের মুখ দিয়ে দোজখীদের, পায়ের তলার মুখ দিয়ে দৈত্য, দানব, জ্বিন ও শয়তানদের প্রাণ সংহার করে থাকেন।

এই আযরাঈল (আঃ) এতই বিস্ময়কর আকৃতির যে মানুষের কল্পনায় আসে না।

তার হাতের তালুতে বিশ্বজগত। প্রতিটি প্রাণীকে, পাহাড়, পর্বত, নদ নদী, সাগর মহাসাগর, তরুলতা উদ্ভিদ সব দেখতে পাচ্ছেন স্পষ্ট। যখনই কোনও প্রাণী সংহারের সময় আসে সে তার নির্দিষ্ট আসনে বসে কাজ শেষ করে।

আযরাঈল (আঃ) এর একটা পা দোজখের উপরে পুলসিরাতের ওপর। অন্য পা বেহেশতের মধ্যে অবস্থিত সিংহাসনের উপর।

বলা হয়েছে, তার দেহ এতই বিরাট যে দুনিয়ার সব নদী-নালা, সাগর-মহাসাগরের পানি যদি তার মাথার ওপর ঢেলে দেয়া হয় তবুও এক ফোঁটা পানি মাটিতে পড়তো না। তার সামনে দুনিয়ার জীবন গুলো এতই ছোট যে যেন নানান খাবারে ভরা একটা থালা। সেটা তার সামনে। তিনি পৃথিবীতে এমনভাবে ওলট-পালট করে থাকেন যেন একটা তামার পয়সা। যা আমরা তালুতে রেখে টস্ করি।

একমাত্র নবী রাসুলদের পবিত্র প্রাণ মুবারক নেবার সময় আযরাঈল (আঃ) দুনিয়াতে আসেন। সব জান কবজের পর তার দেহে মাত্র আটটা চোখ বাকী থাকবে। জিব্রাইল, মিকাঈল, ঈসরাফিল, আযরাঈল ও আরশ বয়ে নেয়া চারজন ফিরিশতার জন্যে।

ফিরিশতাদের সর্দার হচ্ছেন জিব্রাঈল (আঃ)।

আল্লাহতায়ালা কালামে পাকে তাঁর সৌন্দর্য, সৎচরিত্র ও শক্তি সম্পর্কে প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহুম্মা শাদিদুল কুওয়া; যু মির্‌রাতনি ফাশ্‌তাওয়া।'

'তাঁকে (নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শক্তিমান ব্যক্তি জিব্রাঈল (আঃ) শিক্ষা দিয়েছেন। যিনি সৎ চরিত্র ও সুন্দর চেহারার অধিকারী।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'বার তাকে আসল রূপে দেখেছেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন রূপে তিনি তাঁর কাছে আসতেন।

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বলা হয়েছে, 'নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিব্রাঈল আমিনকে তাঁর নিজ আকারে দেখেছেন। ছয়শত পাখা রয়েছে তাঁর। এক একটা পাখা আকাশের শেষ কিনারে পৌঁছেছে। তাঁর পাখা থেকে নানা রঙের মণি মুক্তা ইয়াকুত ও নীলা রত্ন ঝরে পড়ছে।' (মসনদে আহমদ)

মুসলিম শরীফে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বলা হয়েছে, 'নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিব্রাঈল (আঃ) কে তাঁর আপন আকারে দেখেছেন। তিনি একটা সবুজ কাপড়ে ঢাকা, তাঁর দেহ আসমান জমিনকে ঢেকে ফেলেছে।'

আম্মাজান আয়িশা (রাঃ) থেকে বলা হয়েছে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি জিব্রাঈল (আঃ) কে আকাশ থেকে নেমে আসতে দেখেছি। সে মণিমুক্তা খচিত রেশমী পোশাক পরেছিল। তাঁর মাথা সাত আসমানের ওপরে সিদরাতুল মুনতাহায়, পা সাত জমিনের নিচে। ছয়শত পাখা। একটা পাখা ঝাপ্টা মারলে সাড়ে চোদ্দ হাজার বছরের রাস্তা অতিক্রম করে।

কাওমে লুত' লাওয়াতাত' গোনাহে লিপ্ত হয়েছিল।

'লাওয়াতাত' হচ্ছে সমকামিতা। সমকাম। হোমোসেক্স। আল্লাহতায়ালা এই ইতর গুনাহের কারণে অত্যন্ত নারাজ হলেন লুত জাতির ওপর। লুত জাতি সডোম নগরীতে বাস করতো। তাই ইতিহাসের পাতায় সমকামিতার গোনাহকে 'সডোমিয়াত' ও বলা হয়েছে। লুত (আঃ) এর কাছে এলেন ফিরিশতারা। তারা সুদর্শন, সুপুরুষ। উঠতি বয়সের যুবক।

সুদর্শন তরুণ মেহমানদের নিরাপত্তার কথা ভেবে খুবই দুঃচিন্তায় পড়লেন লুত (আঃ)। জাতির কু-স্বভাব সম্পর্কে তিনি জানেন। সডোমের মানুষ নরপিশাচ। হিংস্র হাঙর যেমন রক্তের গন্ধ পেয়ে শিকারের পিছু ধাওয়া করে তেমনি দশা হবে এদের।

'বড়ই বিপদের দিন আজ।' মনে মনে বললেন তিনি।

ওদিকে 'যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়' এর মতো খোদ লুত (আঃ) এর কাফির স্ত্রী খবর দিয়ে দিল গোপনে। উল্লাসে ফেটে পড়লো বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষগুলো।

রাত বাড়ছে। অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠছে নবীর বুক। কী করা যায়।

গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে এলো হিংস্র হায়েনারা। নবীর বাড়িতে পৌছে গেল তারা। নারকীয় উল্লাসে মাতাল হয়ে আছে।

নবী তাদের সাথে কথা বললেন। পিতার মমতা নিয়ে। বললেন, 'যাও বাড়ি যাও। ওখানে তোমাদের স্ত্রীরা রয়েছে। তোমরা তোমাদের বিবেককে জিজ্ঞেস করো কোথায় নেমেছ তোমরা?' নবীর কণ্ঠে আক্ষেপ আর ধিক্কার।

কিন্তু ওই কামার্ত, মাতালেরা তখন হারিয়ে ফেলেছে তাদের সাধারণ জ্ঞানটুকুও। তারা নবীর বাড়ির দেয়াল টপকাতে লাগলো।

নবী কি করবেন?

কি উপায়?

'হে নবী লুত,' যুবকেরা কথা বলে উঠলো, 'কীসের চিন্তায় বিভোর আপনি?'

'ওরা! ওরা ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়েছে!'

'কি হয়েছে তাতে?'

'ওরা নির্মম, হিংস্র, পাষন্ড। আর শারিরীক শক্তিতেও সীমাহীন। ওরা তোমাদের আক্রমণ করবে।'

'কেন?'

'কারণ ওরা সমকামী!'

'ঠিক আছে। আসতে দিন ওদের।'

নবী সান্ত্বনা পেলেন না। আরও দিশাহারা হয়ে পড়লেন। বাড়ির চারদিকে নরপশুদের হল্লা। চিৎকার, পৈশাচিক উল্লাস। দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে।

'ওরা এখনি দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়বে!' কাতর ও ব্যাকুল স্বরে বললেন নবী।

'খুলে দিন দরজা।' নির্বিকার কণ্ঠ যুবকদের।

'তোমরা ওদের সাথে পারবে না। ওরা সংখ্যায় অনেক।'

'তবুও খুলে দিন। নবী আপনি পেরেশানী মুক্ত হোন।'

'কিভাবে! আমার চোখের সামনে.....'

'কিছুই হবে না আপনার চোখের সামনে। আমরা সাধারণ মানুষ বা যুবক নই।'

'তাহলে..'

'আমরা ফিরিশতা!'

রুদ্ধ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন নবী। কথা বলার ক্ষমতাও হারিয়েছেন তিনি। বিস্ময়ে ও আনন্দে।

চোখে তাঁর জল।

খুশির।

দরজা খুলে দিলেন ফিরিশতা যুবকেরা।

বন্যার পানির মতো হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়লো ওরা।

হাল্কা করে পাখার ঝাপটা মারলেন ফিরিশ্‌তা ওদের কামার্ত, লোভে চক চক করতে থাকা চোখে।

অন্ধ হয়ে গেল ওরা।

অসংখ্য অন্ধ।

থেমে গেল গতি।

পালানোর পালা। কে কোন্ দিকে যাবে?

চলছে প্রতিযোগিতা।

ফিরিশতাদের কাজ শেষ।

তাঁরা ফিরে যাবেন। যাবার আগে তাঁরা বললেন, 'নবী, আপনি ও বিশ্বাসীরা আজ রাতের মধ্যেই চলে যাবেন এ শহর ছেড়ে।'

এতদিনের চেনা জন্মভূমি ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। পাহাড় সমান ব্যথা নবীর বুকে। তার সন্তানেরা বুঝলো না। চিনলো না আল্লাহকে। স্ত্রীও না। চোখের পানি ফেলতে ফেলতে ব্যথিত হৃদয় নবী বেরিয়ে পড়লেন বাড়ি ছেড়ে।

গভীর রাত।

নবীর বুক চিরে বের হচ্ছে দীর্ঘশ্বাস।

চোখ বেয়ে অবিরল ঝরছে অশ্রু।

তাড়াতাড়ি পার হতে হবে এ এলাকা।

দ্রুত পা ফেলছেন। দীর্ঘ পদক্ষেপ।

গাঢ় আধার নেমেছে পৃথিবীর বুকে।

তার চেয়েও গাঢ় আধার জমেছে নবীর হৃদয়ে।

ফিরিশতাদের সাথে এই চরম গর্হিত আচরণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বড়ই রাগ করলেন। তিনি জিব্রাঈল (আঃ) কে ডাকলেন। আল্লাহ তায়ালার ক্রোধ সঞ্চারিত হলো জিব্রাঈল আমিনের ভিতর।

মাত্র ভোর হয়েছে।

তখনই সডোমবাসী শুনতে পেল গর্জন। মাটি ফাড়ার শব্দ। কান ফাটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে তাদের। অজানা আতঙ্কে সবাই পড়ল মরি ছুটলো। কিন্তু যাবে কোথায়?

ভয়ানক আত্মা কাঁপানো শব্দে চুরমার হয়ে যাচ্ছে পাহাড়-পর্বত, বাড়ি-ঘর। কে যেন তাদের তুলে নিচ্ছে শূন্যে। মহাশূন্যের অসীম নীলে। আরো উপরে। শুরু হলো পাথরের আর পোড়া মাটির বৃষ্টি। এমন অচেনা দৃশ্য তাদের বোবা করে দিল।

মহাশূন্যে ভাসছে চারলক্ষ মানুষ, পশু, পাখি আর প্রাণী।

আসলে, জিব্রাঈল (আঃ)।

তাঁর ছয়শত পাখার একটা পাখাকে বেছে নিলেন। তার একটা কোণা দিয়ে খোঁচা দিলেন শহরের শিকড়ে। তুলে নিলেন শহরটিকে। সাতটি গ্রাম মিলে সডোম নগরী। মানুষ রয়েছে চার লক্ষ। তার সাথে ছিল তাদের বাহন, চার পেয়ে জানোয়ার, আর শত শত দালান কোঠা। পাখার কোণাটি দিয়ে আকাশের ওপর উঠিয়ে নিলেন। এতো উপরে ওঠালেন যে চতুর্থ আকাশের ফিরিশতা তাদের পুরুষদের ভয়ার্ত চিৎকার, নারীদের আর্তনাদ, পশুপাখি ও মোরগের ভয়ার্ত ডাকাডাকি শুনতে পেলেন।

মহাশুন্য থেকেই উল্টে দিলেন তিনি শহরটিকে। প্রচন্ড ক্রোধে।

তীব্র গতিতে ছুটে এলো চার লক্ষ অধিবাসী সহ শহর। মাটির দিকে। নিমিষেই শহরটি মাটি ছুঁলো। মাটি ফাড়ার শব্দ হলো। কেটে দু'ভাগ হয়ে গেলো। জায়গা করে নিল সডোম নগরী। তবুও তার গতি থামলো না। সে মাটি চিরে, ফুঁড়ে এগুতে থাকলো। তীব্রগতিতে। মাটির স্তর তার সাথে নেমে যাচ্ছে ভূতলে। ধীরে ধীরে মাটির জায়গায় বেরিয়ে পড়লো পানি। দিগন্ত বিস্তৃত বিশাল জলাশয়। কোন নদ বা নদী নয়। সাগর। ডেড সী! 'মৃত সাগর' বলে।

কারণ ওখানে কোনও জীবনের চিহ্ন নেই। সেদিনও ছিল না। আজো নেই। কেয়ামত পর্যন্ত কোনও প্রাণী ওখানে বাঁচবে না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। শহরটি পানি চিরে চিরে আরও নিচে নামছে। মহাপ্রলয় দিবস পর্যন্ত নামতেই থাকবে।

হাদীস শরীফে আসছে 'অমিন শিদ্দাতি কুওয়াতিহি আল্লাহু রাফাআ মাদাইনা কাওমি লুতিন আলাইহিস সালামু অকুন্না শাব্‌আন্ বিমান্ ফিহিন্না মিনাল্ উমামি অকানু কারিবাম্ মিন্ আরবাঈ মিআতি আল্‌ফিন অমা মাআ'হুম মিনাদ্ দাওয়াব্বি অল্ হায়ওয়ানাতি অমা লি তিল্‌কাল্ মাদাইনি মিনাল্ আরাদি অল্ ইমারাতি আলা তারফি জানাহিহি হাত্তা বালাগা বিহিন্না আনানাশ্ শামাঈ হাত্তা শামি আ'তিল মালাইকাতু নুবাহা কিলাবিহিম অসিয়াহা দিয়াকাতিহিম সুম্মা ক্বালাবাহা ফাজাআলা শাফিলাহা ফাহাযা হুয়া শাদিদুল কুওয়া।'

'তাঁর (জিব্রাঈল (আঃ) শক্তির অন্য নিদর্শন এই যে, তিনি কাওমে লুত (আঃ) এর শহরকে, যা সাতটা গ্রামের সমষ্টি, উপরে উঠিয়েছিলেন। তারা প্রায় চার লক্ষ লোক ছিল। সাথে ছিল ওদের বাহন, চারপেয়ে জানোয়ার আর মাদায়েনের মাটির শত শত দালান কোঠা। সবাইকে তার এক পাখায় উঠিয়ে আসমান পর্যন্ত গিয়েছিলেন। তারপর তিনি তা এমন ভাবে উল্টে দিলেন যে উপরের অংশ নিচে আর নিচের অংশ উপরে চলে গেল।'

তো ভাই,

চিন্তার ব্যাপার, একটা পাখার একটু কোণা মাত্র! সুব্‌হানাল্লাহ! একটু কোণাতে যদি এতো বড় শক্তি থাকে তাহলে গোটা পাখাটিতে কত বড় শক্তি। দুটো পাখায় কত শক্তি। দশটি পাখায় কত শক্তি। পঞ্চাশটি পাখায় কত শক্তি! একশত পাখায় কত শক্তি! দু'শো পাখায় কত শক্তি! পাঁচশত পাখায় কত শক্তি! ছ'শো পাখায় কত শক্তি ও ক্ষমতা!

এই জিব্রাঈল (আঃ) যদি মানুষকে নাফরমানীর জন্যে ধরেন কি উপায় হবে। তাঁর একটা চিৎকারে হিজর বাসীদের যুগ যুগের সাধনা লব্ধ বাড়িঘর চৌচির হয়ে ফেটে বালুকা স্তূপে পরিণত হয়েছিল!

যার চিৎকারে, যার পাখার একটা কোণায় এতো শক্তি তার গোটা দেহে কত শক্তি!

যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চোখের পলকে এমন অসংখ্য জিব্রাঈল (আঃ) পয়দা করেন, করতে পারেন তাঁর নিজের কত শক্তি। তাকে আমরা চিনলাম না, জানলাম না, মানলাম না।

যদি আমরা তাঁর হতাম?

তিনি যদি আমাদের হতেন?

এই দুনিয়া কাদের পায়ের তলায় আসতো, ভাই?

কত বড়ো ক্ষমতার অধিকারী হতাম আমরা।

এই আল্লাহকে চেনা আর জানার জন্যে চাই নির্জনতা। নিরিবিলি মসজিদে একটানা একশো কুড়ি দিন। চল্লিশ দিন। তাঁর গৌরব আর অহঙ্কারের দাওয়াত। তালীম, জিকির আর ইবাদতে সময় কাটালে দূর হবে অন্তরের ময়লা। জ্বলে উঠবে আলো। আত্মায়।

পরিষ্কার ধরা দেবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর প্রকৃত পরিচয় নিয়ে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বলা হয়েছে, 'ঈসরাফিল (আঃ) এর গোটা শরীরে অগণিত পাখা। জাফরানি রঙের। তার প্রতিটি পশমে হাজার হাজার মুখ। প্রতিটি মুখে হাজার হাজার জিভ। প্রতিটি জিভ অসংখ্য ভাষায় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রশংসা করে যাচ্ছে। ইসরাফিল (আঃ) শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে। প্রতি দমে তৈরি হচ্ছে একটা ফিরিশতা। সে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর গুনগান করতে থাকে। আবু শাঈখ, আবু নাঈম হুলিয়াতে বর্ণনা করেছেন, 'ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বলা হয়েছে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আরশ বহণকারী ফিরিশতাদের মধ্যে একজন ঈসরাফিল। আরশের একটি খুঁটি তাঁর কাঁধের উপর। তাঁর দু'পা সাত জমিন পর্যন্ত পৌছে গেছে। তাঁর মাথা সাত আসমানের উপরে উঠেছে।

আবু শায়খ আওজা'য়ী থেকে বলা হয়েছে, তিনি বলেন, 'আল্লাহর সৃষ্টি জীবের মধ্যে ঈসরাফিল (আঃ) এর চেয়ে বেশি সুন্দর কণ্ঠস্বর আর কারও নেই। তিনি যখন তাসবীহ্ পাঠ

শুরু করেন, আকাশবাসীরা তাদের তাসবীহ পড়া আর সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকেন। কারণ তারা তখন শোনাতে মগ্ন।'

হযরত ঈসরাফিল (আঃ) শিঙ্গার তত্ত্বাবধায়ক।

মহান আল্লাহ তায়ালা রাব্বুল আলামিন আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে যে দূরুত্ব তার চেয়ে সাতগুণ অর্থাৎ পয়ঁত্রিশ শত বছরের রাস্তা সমান চওড়া করেছেন লাওহে মহাফুজকে। মহামূল্যবান মণিমুক্তা দিয়ে সাজিয়েছেন এই লাওহে মাহফুজকে। তারপর তাকে ঝুলিয়ে দিয়েছেন আরশের সাথে। মহাপ্রলয় পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সব তাতে লিখে রেখেছেন।

হযরত ঈসরাফিল (আঃ) এর পাখা মাত্র চারটা। প্রথম ও দ্বিতীয় পাখা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের শেষ সীমা পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। তিন নম্বর পাখার ওপর তিনি নিজেই বসে রয়েছেন। আল্লাহর ভয়ে ও লজ্জায় তিনি চার নম্বর পাখা দিয়ে নিজ মুখকে ঢেকে রেখেছেন। আল্লাহর ভয়ে তিনি এতই ভীত ও লজ্জিত যে নিজ পাখায় মাথা ঢেকে আরশের খুঁটি জড়িয়ে ধরে মাথা নিচু করে পড়ে আছেন। আর তাকে দেখাচ্ছে ছোট্ট একটা পাখির মতো।

ঈসরাফিল (আঃ) মুখের পর্দা শুধু তখন সরান যখন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর আদেশ নিষেধ জারি করেন। সে সময় লাওহে মাহফুজে আল্লাহর হুকুম প্রতিফলিত হয়। তিনি আল্লাহতায়ালার সবচেয়ে কাছের।

তবুও তাঁর ও আরশের মধ্যে সত্তর হাজার পর্দার অন্তরাল। একটা পর্দা থেকে আরেকটি পর্দার দূরত্ব পাঁচশত বছরের রাস্তা।

হযরত জিব্রাঈল (আঃ) ও ঈসরাফিল (আঃ) এর মধ্যেও সত্তর হাজার পর্দার অন্তরাল। একটা পর্দা অন্যটির চেয়ে পাঁচ শত বছরের রাস্তা দূরে।

ঈসরাফিল (আঃ) তাঁর ডান উরুর ওপর শিঙা রেখে তার গোড়া মুখে লাগিয়ে অপেক্ষায় রয়েছেন। আল্লাহর আদেশের। কখন তিনি হুকুম দেবেন। তিনি আদেশ দেয়া মাত্রই সজোরে শিঙায় ফুঁ দেবেন। দুনিয়ার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে তাঁর কাছে আদেশ আসবে। চারটা পাখা এক করবেন শরীরের সাথে। তারপরেই ফুঁ দেবেন সজোরে। ওই সময় আযরাইল (আঃ) সক্রিয় হয়ে উঠবেন। তাঁর এক হাত থাকবে সাত জমিনের নিচে। আরেক হাত থাকবে সাত আসমানের ওপরে। যাবতীয় প্রাণীয় প্রাণ ছিনিয়ে নেবেন তিনি তখন।

আল্লাহতায়ালা বলেন, 'অনুফিখা ফিস্‌সুরি ফাইজা হুম্ মিনাল্ আজ্‌দাসি ইলা রাব্বিহিম ইয়ানসিলুন।'

'যখন শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে দলে দলে মানুষ ছুটে চলবে হাশরের মাঠের দিকে।'

অন্য জায়গায় বলেন, 'অনুফিখা ফিস সুরি ফাসারিকা মান ফিস্ সামাওয়াতি ওয়াল্ আর্‌দি ইল্লা মান্ শায়াল্লাহু।'

'আর শিঙায় ফুঁ দেবার সাথে সাথেই আকাশ ও ভূমন্ডলের সবাই জ্ঞানহারা হয়ে যাবে। কিন্তু ওরা ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ নিরাপদে রাখতে চান।'

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বলা হয়েছে; হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহতায়ালা হযরত ঈসরাফিল (আঃ) এর শিঙা চারটে শাখা করে তৈরি করেছেন। দুটো শাখা দুনিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম কিনার পর্যন্ত পৌছে গেছে। একটি শাখা জমিনের নিচে। অন্যটি সাত আসমানের উপরে উঠে গেছে। তাঁর শরীর জুড়ে রয়েছে অসংখ্য ছিদ্র। আত্মার স্তর হিসেবে ওগুলো ভিন্ন ধরনের। নবীদের আত্মার জন্যে আলাদা, মানুষের জন্যে এক ধরনের, জ্বিনদের জন্যে আবার আলাদা। শয়তানের জন্যে ভিন্ন। কীট, পতঙ্গ, জীব, জানোয়ারের জন্যে আবার আলাদা। মসনদে আবু ইয়ালা, বায়হাকী, ইবনে জারীর, তাবারী থেকে আবু হোযায়ফা (রাঃ) এর একটা হাদীসে পাক জানা যায়।

হযরত হোযায়ফা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে, 'হে আল্লাহর রাসুল, শিঙায় ফুঁ দেয়ার সাথে সাথে মানুষের কী অবস্থা হবে?

তিনি (সাঃ) বললেন, 'হোযায়ফা! আমার আত্মা যাঁর হাতে তাঁর শপথ! শিঙা বাজানোর সাথে সাথে ক্বিয়ামত ঘটে যাবে। এমন অবস্থা হবে যে মুখের কাছে ওঠানো লোকমা গিলে ফেলার ক্ষমতা থাকবে না। হাত থেকে পড়ে যাবে। পোশাক সামনে থাকবে পরার অবকাশ

পাবে না। পানির পেয়ালা সামনে থাকবে কিন্তু তৃষ্ণা মিটাতে পারবে না। বড় সঙ্গীন সময়, বড় কঠিন সময়!'

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, 'অইয়াকুলুনা মাতা হাজাল ওয়াদু ইন কুনতুম সাদিকিন।'

'তারা কি আপনাকে জিজ্ঞেস করছে কবে কিয়ামাত হবে?'

'মা ইয়ানজুরুনা ইল্লা শায়হাতাঁও অহিদাতান তাখুজুহুম অহুম্ ইয়া খিস্ সিমুন।'

'তাদের বলুন, একটা মাত্র ভয়াবহ ধ্বনি হবে তা তাদেরকে তর্ক বিতর্ক অবস্থায় ধরে ফেলবে।'

অন্য জায়গায় আল্লাহতায়ালা বলেন, 'অ-ইয়া কুলুনা মা তা হাজাল ওয়াদু ইন্ কুনতুম সদিকিন।'

'তারা কি আপনাকে জিজ্ঞেস করছে কবে মহাপ্রলয় ঘটবে?'

'কুল ইন্নামাল ইলমু ইন্দাল্লাহা অইন্নামা আনা নাজিরুম্ মুবীন।'

'তাদের বলুন, এসবের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহতালাই জানেন। তিনিই তা প্রকাশ করে দিবেন।'

হযরত ঈসরাফিল (আঃ) মোট তিনবার শিঙায় ফুঁ দিবেন।

প্রথম বারে যাবতীয় সৃষ্টি ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়বে।

আল্লাহতায়ালা বলেন, 'ইয়াওমা নাতরীস্ সামাঈ কাতাইয়িশ্ শিজিল্লিল কুতুব।'

'সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গোটানো হয় লিখিত কাগজপত্র।'

বোখারী শরীফে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বলা হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহতায়ালা কিয়ামতের দিন সাত আসমানকে তাদের মাঝে যা কিছু সৃষ্ট বস্তু আছে আর সাত পৃথিবীকে তার সব জিনিস সহ গুটিয়ে এক করে দেবেন। সবগুলো মিলে আল্লাহ তায়ালার হাতে সরিষার একটা দানার মতো হবে।'

আল্লাহতায়ালা বলেন, 'ইয়া আইয়্যুহান্নাসুত্তাকু রাব্বাকুম; ইন্না জালজালাতাশ্ শাআতি শাইয়ুন আজিম।'

'হে মানব! ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে! ঐ বড় দিনের ব্যাপারে যেদিন দেখা দেবে প্রবল, ভয়ঙ্কর ভূকম্পন।'

'ইয়াওমা তারাওনাহা তায্হালু কুল্লু মুরদিআতিন্ আ'ম্মা আরদাআত্ অতাদাউ কুল্লু জাতি হাম্লিন হাম্লাহা অতারান্নাসা শুকারা অমাহুম বিশোকারা অলাকিল্লা আযাবিল্লাহি শাদীদ?'

'সেদিন তোমরা দেখতে পাবে প্রত্যেক দুধ পান করানো মা তার শিশুকে ভুলে গেছে; প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে। আর মানবকে তুমি দেখতে পাবে নেশাগ্রস্থ মাতালের মতো! আসলে তারা মাতাল নয়, তাদের প্রভুর ভয়ংকর শাস্তি তাদের ধরে ফেলেছে!'

ঈসরাফিল (আঃ) এর শিঙার প্রচন্ড শব্দে গোটা বিশ্বজগত প্রবলভাবে কেঁপে উঠবে। দুলতে থাকবে জমিন আসমান। কাঁপতে থাকবে পাহাড় পর্বত। উছলে উঠবে নদনদী, সাগর মহাসাগরের পানি। প্রাণী জগত অধীর আর অস্থির হয়ে পড়বে।

জুম্মার দিন হবে।

মহররম মাসের দশ তারিখ হবে।

সুবহে সাদেকের সময় ফুঁ দিবেন ঈসরাফিল (আঃ)। সুরেলা, মধুর সুর শুনবে জগৎবাসী।

বেলা বাড়বে। সুর কেটে যাবে। মধুরতা নষ্ট হবে। তীক্ষ্ণতা বাড়বে। আর আওয়াজ ক্রমশঃ কর্কশ হয়ে উঠবে। এতো কর্কশ ও বিদঘুটে হবে যে মানুষ দিশাহারা হয়ে যাবে। সবার চোখে একই প্রশ্ন, 'কোত্থেকে আসছে এমন শব্দ!?'

একজন বলবে উত্তর দিক থেকে। আরেকজন বলবে দক্ষিণ দিক থেকে। কেউ বলবে পূর্বে। কেউ বলবে পশ্চিমে।

জমিন ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। আকাশ লাল রঙ ধারণ করবে। ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে মানুষ। কারণ দাঁড়ানো, বসা ও শোয়ার জায়গা লাল রঙ হয়ে ফেটে পড়বে। শিঙার ধ্বনির কম্পন ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছে। পাহাড় কাঁপছে। চৌচির হয়ে যাচ্ছে মাটি। ছুটতে শুরু করেছে মানুষ। প্রাণের ভয়ে। দিগ্বিদিক। যেদিকে যায় স্রোতের মতো ভেসে আসে হাজার হাজার মানুষ উল্টো দিক থেকে। হুড়মুড় করে। ভয়ার্ত, দিশাহারা। তারা চিৎকার করেছে। 'এদিকে নয়, ওদিক ওদিক-'

এই দলটি যেদিকে ছুটছে কিছুদূর যেতেই ঠিক উল্টো দিক থেকে আরেকটি দল ছুটে আসছে। পড়িমড়ি, পাগলের মতো। দৃষ্টি বিস্ফোরিত! কারণ পেছন থেকে জমিন ফেটে ফাঁক হয়ে গেছে। আর সেই ফাঁক ক্রমশঃ বড় হচ্ছে। হাজার হাজার মানুষ তলিয়ে যাচ্ছে গভীর খাদের অতল অন্ধকারে।

মানব সন্তানরা আজ কোনদিকে যাবে?

কোথায় আশ্রয়?

চোখের পলকে লক্ষ মানুষের আত্মা কবজ হয়ে যাচ্ছে।

'ইজা জুল্জিলাতিল আরদু জিল্জালাহা।'

'যখন পৃথিবী প্রচন্ড কম্পনে কম্পিত হবে।'

'অ আখ্রাজাতিল আরদু আস্কালাহা।'

'যখন ভূপৃষ্ঠ তার বোঝা উগরে বের করে দিবে।'

'অক্বালাল ইনসানু মা'লাহা।'

'মানুষ বলবে, 'কি হলো পৃথিবীর?'

প্রচন্ড শব্দের তান্ডবে মাটির ভিতরের খনিজ দ্রব্য সে বমি করার মতো বের করে দেবে। পৃথিবী তার কলিজার টুকরো বিশাল সোনার পিন্ড আকারে উদগীরণ করে দেবে।

তখন যে ব্যক্তি ধন সম্পদের জন্যে কাউকে হত্যা করেছিল সে বলবে, 'এর জন্যেই কি আমি এত বড় অপরাধ করেছি? চুরির জন্যে যে হাত কাটা গিয়েছিল সে বলবে, এর জন্যেই আমার হাত আমি হারিয়েছিলাম?'

পাহাড় পর্বতে ফাটল ধরবে। চৌচির হয়ে যাবে। ভেঙে ভেঙে পড়বে। বিশাল আল্পস পর্বতমালা, বিশাল আন্ডেজ পর্বতমালা, সুবিশাল সিনাই পর্বতমালা, বিশাল হিমালয় পর্বতমালা, চলতে শুরু করবে। প্রথমে ধীরে ধীরে, পরে দ্রুত গতিতে। যেমন রানওয়ের উপর উড়োজাহাজ আকাশে ওড়ার প্রস্তুতি হিসেবে ছুটতে শুরু করে। পরে ডানা মেলে উড়ে যায়। তেমনি পাহাড় পর্বত ছুটতে শুরু করবে ফুঁ এর তান্ডবে। তারপর আচমকা ওপর দিকে উঠতে শুরু করবে। প্রথম সামান্য তারপর পুরোপুরি শুন্যে উড়ে যাবে। ধূণিত তুলার মতো!

'অতাকুনুল জিবালু কাল্ ইহ্নিল মানফুশ্।'

'পাহাড়গুলো উড়তে থাকবে ধূনো তুলোর মতো।'

'ইজাশ্ শামাউন্ ফাতারাত।'

'যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে।'

সূর্যের মুখ কালো হয়ে যাবে। শুধু উত্তাপ থাকবে। কোনো আলো নেই।

'অইজাল কাওয়াকি বুন্তাসারাত্।'

'যখন তারাগুলো ঝরে পড়বে।'

'অইজাল বিহারু ফুজ্জিরাত্।'

'যখন সাগরগুলো ফুঁসে উঠবে।'

সাগর উত্তাল হয়ে পাহাড় প্রমাণ ঢেউগুলো ছুটে আসবে স্থলভাগের দিকে।

'অইজাল কুবুরু বু'সিরাত।'

'যখন কবরগুলো খুলে যাবে।'

মানুষ দলে দলে পিঁপড়ার সারির মতো উঠে আসবে।

'ইজাশ্ শামসু কুব্বিরাত।'

'যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে।'

রবী ইবনে খায়সাম 'ইজাশ্ শামসু কুব্বিরাত।' এর তাফসীর করেছেন। সূর্যকে নিক্ষেপ করা হবে সমুদ্রে। প্রথমে জ্যোতিহীন করে দেয়া হবে। সহীহ বোখারীতে আবু হোরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করে বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'কিয়ামতে

দিন চন্দ্র ও সূর্যকে জ্যোতিহীন করে তাদের অবস্থান থেকে ছিঁড়ে এনে ছুঁড়ে ফেলা হবে মহাসমুদ্রে। মুসনাদে আহমদে আছে, 'জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে চাঁদ আর সুরুজকে।' এই আয়াত প্রসঙ্গে আরো কয়েকজন তাফসীরবিদ বলেন যে, চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্র সমূহকে আল্লাহতালা মহাসমুদ্রে ছুঁড়ে দেবেন। তারপর প্রবল বাতাস বইবে। আগুন ধরে যাবে মহাসমুদ্রে।

'অইজান্ নুজুমুন্ ক্বাদারাত।'

'যখন তারাদের আলো নিভে যাবে।'

'অইজাল জিবালু সুয়্যিলাত।'

'যখন পাহাড়গুলো চলমান হবে।'

'ইয়াওমা তারজুফুল আরদু অল জিবাল অ-কানাতিল জিবালু কাসিবাম্ মাহীলা।'

'যেদিন পাহাড়গুলো উড়তে থাকবে। একটার ... একটা সংঘর্ষিত হবে। তারপর বালুর মতো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে।'

'অইজাল ইশারু উত্তিলাত্।'

'যখন দশমাসের গর্ভবতী উটের কোন মূল্য থাকবে না।

আরবদের কাছে দশমাসের গর্ভবতী উট খুবই মূল্যবান ছিল। তারা এর বাচ্চার জন্যে অপেক্ষা করতো। চোখের আড়াল হতে দিত না। পৃথিবীর আকর্ষণ স্বপ্নের মতো মিলিয়ে যাবে। যেন ঘুম ভেঙে গেছে। এমন নির্মম বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াবে সেদিন মানুষ।

'অইজাল্ বিহারু সুয়্যিরাত্।'

'সমুদ্রে আগুন ধরে যাবে।'

পানিতে আগুন নেভে। কিন্তু শিঙার প্রবল কম্পনে সমুদ্রে ধরে যাবে আগুন। যাতে মানুষ বেশি দিশেহারা হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও আরও বেশ ক'জন তাফসীরবিদ বলেন, 'তখন লোনা পানি ও মিষ্টি পানির দেয়াল ভেঙে যাবে। পানি একাকার হয়ে যাবে। চাঁদ, সুরুজ, তারা নিক্ষিপ্ত হবে। বাতাস বয়ে যাবে প্রবল। উত্তাল হয়ে উঠবে সাগর, মহাসাগর। প্রলয়ঙ্করী রূপ ধারণ করবে। ধীরে ধীরে আগুন ধরে যাবে। মহাসমুদ্রে। দাউ দাউ করে। লেলিহান শিখা মেলে ধরবে।

'অইজান, নুফুসু জুব্বিজাত।'

'যখন মানুষকে জড়ো করা হবে।'

'ইজাশ্ শামাউন্ শাক্কাত।'

'যখন আকাশ ফেটে চিরে যাবে।'

'অ আজিনাত্ লিরাব্বিহা অহুক্কাত্।'

'ও তার প্রভুর আদেশ পালন করবে। আর আকাশ এরই উপযুক্ত।'

'অইজাল্ আরদু মুদ্দাত্।'

'আর যখন ভূপৃষ্ঠকে সম্প্রসারিত করা হবে।'

'অ আলকাত্ মা ফিহা অ তাখাল্লাত্।'

'তখন পৃথিবী তার ভেতরের সব কিছু ছুঁড়ে দেবে বাইরে।'

সেদিন পৃথিবী তার ভেতর লুকোন মহামূল্যবান ধাতু ও পদার্থগুলো বমি করে দেবে। নতুন পৃথিবী। তাতে থাকবে না কোনও বাড়িঘর, দালান কোঠা, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সমুদ্র-মহাসমুদ্র, তরু-লতা। সুবিশাল সমতল চত্বর।

'অইজাল আরদু মুদ্দাত।' মানে হচ্ছে টেনে লম্বা করা। অর্থাৎ সমতল ভূমিটিকে টেনে লম্বা করা হবে।

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'ক্বিয়ামাতের দিন পৃথিবীকে রাবারের মতো টেনে লম্বা করা হবে। তারপরও শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত মানুষেরা সেখানে শুধু পা রাখার জায়গাটুকু পাবেন।'

'ইজাশ্ শামাউন শাক্কাত।'

'আকাশ বিদীর্ণ হবে।'

ঠিক এমনিভাবে সুরা আর রাহমানে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'ফাইজান্ শাক্কাতিশ শামাউ ফাকানাত্ অরদাতান্ কাদ্দিহান।'

'যেদিন আকাশ চৌচির হবে, লাল চামড়ার রঙ ধরবে। আর ফেটে মাটিতে ঝুলে পড়বে।'

তারাগুলো কক্ষচ্যুত হয়ে যাবে। ছিটকে পড়বে সমুদ্রে। সৌরমন্ডল পরস্পর পরস্পরের সাথে সংঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ঝরে পড়বে মহাসমুদ্রে।

'ইজ্জা অকাআতিল ওয়াকিয়াত।'

'যেদিন মহাপ্রলয় ঘটবে।'

'লায়শা লিওয়াক্ আহিতা কাযিবা।'

'যাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।'

'খাফিদাতুর রাফিয়া।'

'এটা নিচু করে দিবে বা উঁচু করে দিবে।'

'ইজা রুজ্জাতিল আরদু রাজ্জা।'

'যখন প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী।'

'অ বুশ্শাতিল জিবালু বাশ্শা।'

'পর্বতমালা গুলো ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।'

'ফাকানাত হাবাআম্ মুম্ বাস্সা।'

'সেগুলো বালুকণার মতো উড়তে থাকবে।'

সেদিন বালক বৃদ্ধে পরিণত হবে। চন্দ্র ও সূর্যে গ্রহণ লাগবে। প্রবল কম্পনে বিশ্বজগত হেলতে দুলতে থাকবে। বিরতিহীন ভয়াল কম্পন! বেলা যত বাড়তে থাকবে ধ্বংসলীলা ততই বাড়বে। পাহাড়ে ফাটল, জমিনে ফাটল, বাড়িঘর ভেঙে পড়বে। ওদিকে পাঁজর ভেঙে ফেলা শব্দতরঙ্গ কানে বাড়ি মারবে। ফেটে যাবে কানের পর্দা। ওদিকে আকাশ থেকে ভেসে আসছে বজ্রনিনাদ। মহাশব্দের দাপটে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বস্তি, জনপদ, পাহাড় পর্বত। আর্তনাদ আর ভয়ার্ত চিৎকারে নরক গুলজার। কারও কথা কেউ শুনতে পাচ্ছে না।

দ্বিতীয় ফুঁ দেয়ার সাথে সাথে সমস্ত প্রাণীকুল একসাথে মারা যাবে। মাত্র বারোজন সম্মানিত ফিরিশিতা ছাড়া। আর ইবলিস!

তার পিছু ধাওয়া করবেন আজরাইল (আঃ)। সে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটবে। শেষমেশ আদম (আঃ) এর কবরের সামনে তার জান কবজ করা হবে।

এবার জলরাশি ধ্বংস হবার পালা।

তারা আল্লাহর অনুমতি নিয়ে আর্তনাদ করে বলবে, 'হে আমার তরঙ্গরাজি ও আশ্চর্যজনক বস্তু তোমরা কোথায়? আল্লাহর আদেশে তোমরা নিঃশেষে হয়ে যাও।'

পানি সাথে সাথে উধাও হয়ে যাবে।

এমন যেন কোনও দিন পানির অস্তিত্ব ছিলনা।

এভাবে আগুন ও বাতাস ধ্বংস হবে।

সব শেষে আজরাঈল (আঃ)।

সবশেষ।

এবার আল্লাহতায়ালা বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করবেন, 'লিমানিল্ মুল্কিল্ ইয়াওম্।' বলো আজকের দিনে কে আছো রাজত্বের মালিক? কে আছো রাজপুত্র? কোথায় রাজারা?' কোনও জবাব নেই। নিঃশব্দ দুনিয়া। নীরব রবে পৃথিবী।

'লিল্লাহি ওয়াহিদিল কাহ্হার।'

'একমাত্র ক্রোধান্বিত একক প্রভুই আছেন।'

তো ভাই, বুজুর্গ ও বন্ধু!

যে ঈসরাফিল (আঃ) এর একটা ফুঁ-এ এমন প্রচন্ড তান্ডব আর প্রলয়লীলা সংঘটিত হবে সেই ঈসরাফিল (আঃ) এর মুখে কতো শক্তি! হাতে কতো শক্তি! গোটা শরীরে কতো শক্তি!

যে আজরাঈল (আঃ) এর হাতের তালুতে গোটা দুনিয়া তাঁর হাত কত বড়। পা কত বড়! শরীরটা কত বড়!

যে মিকাঈল (আঃ) মাথায় সাত সাগরের পানি ঢাললে জমিনে এক ফোঁটা পড়বে না তাঁর শরীরটা কত বড়।

যে জিব্রাঈল (আঃ) এর একটা চিৎকারে একটা জাতি হৃদয় ফেটে মারা যায়। তার দশটা চিৎকারের কত ক্ষমতা! যে মুখ দিয়ে চিৎকার দেন তাতে কত শক্তি! তাঁর শরীরে কত শক্তি!

তার একটা পাখার একবার ঝাপটা মারলে সাড়ে চৌদ্দ হাজার বছরের রাস্তা অতিক্রম করে; তাহলে ছয়শত পাখা ঝাপটা মারলে কি দূরত্ব অতিক্রম করেন। একটা পাখার একটা কোণায় যদি এত শক্তি থাকে তাহলে গোটা পাখায় কতো শক্তি। ছয়শত পাখায় কত শক্তি!

যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চোখের পলকে হাজার, লক্ষ, কোটি জিব্রাইল, মিকাঈল, ঈসরাফিল ও আজরাইল পয়দা করতে পারেন তাঁর নিজস্ব কতো শক্তি।

তাকে তো চিনলাম না। হায়!

তাঁকে তো জানলাম না। হায়!

তাঁকে তো আপন করলাম না। হায়! হায়!

যদি তিনি আমাদের হতেন?

যদি আমরা তাঁর হতাম?

তাহলে কোন্ শক্তি আজ মুসলমানদের সামনে দাঁড়ায়?

কে মুসলমানকে পদানত করে?

কে অপমান করে?

কে লাঞ্ছিত করে?

কে মুসলমানের দিকে চোখ তুলে তাকায়?

কিভাবে বসনিয়া হার্জেগোভিনায় করুণ কলঙ্কজনক ইতিহাস তৈরি হয়?

এত বড় অপমানের বোঝা মুসলমানের কাঁধে কেন?

ইতিহাসে এর চেয়ে অসহায় অবস্থা আর কখনো মুসলমানদের হয়নি। কেন?

কেন বাব্রী মসজিদ ভেঙে গেল?

কেন আফগানিস্থানের পাহাড়ের কন্দরে কন্দরে কান্নার রোল। রক্তের হোলি খেলা। কেন কাশ্মীরে লাঞ্ছিত আমরা, আমার মা ও বোনেরা?

কেন লুণ্ঠিতা, ধর্ষিতা হলো বসনিয়ান, রোহিঙ্গা, মোরো মুসলামান নারী?

কারণ আমি চিনিনা আমর প্রভুকে, প্রতিপালককে।

কে তিনি? কী তাঁর ক্ষমতা? কী তাঁর পরাক্রম? কী তাঁর মহিমা? আমার সাথে তাঁর সম্পর্ক কি? কি কি সাহায্যের জন্যে তিনি আমাদের সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কোন কোন কাজ করলে তিনি তা প্রতিপালন করবেন। জানিনা।

জানিনা কী তার পরিচয়?



জমাট অন্ধকারে ঐন্দ্রজালিক জ্যোতির জয়গান

আমরা সারাদিন মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে ডেকে ঘুমিয়ে ছিলাম। নিবিড় নিশীথে হিরন্ময় হাতের ছোঁয়া ঘুম থেকে তুলে অলৌকিক জায়নামাজে দাঁড় করিয়ে দিল।
আমরা আবার ডাকলাম। আল্লাহকে। মানুষের দিকে।
আমরা সারারাত কাঁদলাম। মানুষের জন্যে।
'ক্ষমা করো, ক্ষমা করো' করে ডাকতে ডাকতে কখন যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি। আচমকা কীসের ছোঁয়ায় চমকে চোখ তুলে দেখি আমাদের চারপাশ জ্বলছে। সুতীব্র আলোয়। দেখি, আমাদের হাতে দুপুরের সূর্য!



ডাক সম্প্রদায়